প্রবাসী

ষষ্ঠ বর্ষ

শারদীয়া ১৪৩২

SIERRA PACIFIC
PRIVATE WEALTH

www.sierrapacificpw.com

TAX-EFFICIENT WEALTH MANAGEMENT FOR TECH AND BIOTECH PROFESSIONALS

About Us

At Sierra Pacific Private Wealth, we help high-net-worth tech and biotech professionals optimize their wealth. As fee-only fiduciaries, we offer personalized financial plans to simplify the complexities of wealth management so you can focus on building opportunities and leaving a lasting legacy.

Services

- Executive Compensation Planning
- Tax-Efficient Diversification of Concentrated Stock
- Personal Financial Planning
- Tax-Aware Investing
- Estate Planning & Wealth Transfer
- Philanthropic Investing Advisory

Contact Us

(925) 223-8868

info@sierrapacificpw.com

www.sierrapacificpw.com

7077 Koll Center Parkway, Suite 120, Pleasanton, CA 94566

SIERRA PACIFIC PRIVATE WEALTH
Tailored Wealth Management for Tech & Biotech Professionals

Janet Wan

Janet is the Founder and President of Sierra Pacific Private Wealth, LLC, a fee-only, SEC-registered advisory firm in Pleasanton, California. With 30+ years of experience, she advises tech executives and professionals on equity compensation, legacy planning, and philanthropy. Her firm also guides Prabasi's charitable giving, aligning generosity with strategic financial stewardship.

A Message For the Next Generation

It is with immense pleasure and a deeply felt sense of comunity that I offer this note for the Bay Area Prabasi's annual literary magazine.

For decades, Prabasi has been a vibrant cornerstone for the Bengali diaspora in the Bay Area, a place where our roots are celebrated and our future is nurtured. As an entrepreneur, I've seen firsthand how a compelling narrative can bring an idea to life, galvanize a team, and inspire an audience. But as a philanthropist, I'm even more convinced of the unique ability of literature to achieve something far more profound: to cultivate empathy and deepen our collective humanity.

The work of Prabasi, through its cultural and philanthropic initiatives, mirrors the spirit of this magazine: bringing light and support where it is needed most. The organization's unwavering commitment to both preserving culture and driving tangible social good continues to inspire me profoundly. It is a powerful reminder that our identity is not a static memory, but a living, breathing force that motivates us to give back. The scholarships, disaster relief efforts, and cultural programs supported by Prabasi show us that an engaged diaspora can be a force multiplier for positive change, both here in the Bay Area and in India. As a proud Chief Patron of Prabasi, I see the magazine's pages as a platform, not just for reflection, but for guidance.

A Message to the Next Generation

Many people often asks me the secret to success in life- To the young minds of our community, the future leaders who are navigating life in this vibrant land, I offer three simple, yet critical, anchors:

Commit to High-Quality Work: Whether in technology, art, business, or medicine, embrace the Bengali value of excellence. Do not settle for adequacy. Focus on craftsmanship, integrity, and relentless pursuit of innovation. Your reputation will be built on the quality and depth of your contributions.

Cherish the Anchor of Family: The fast pace of the Bay Area can be demanding, but never let the pursuit of success erode your foundation. Your family—your parents, siblings, extended kin and your community—is your primary source of strength, values, and identity. Invest in these relationships; they will ground you when the world feels chaotic.

Prioritize Giving Back: We stand on the shoulders of the community that built this organization. As you achieve success, remember the critical role of philanthropy and service. Give back to Prabasi, support causes that resonate with you, and mentor those who follow. True fulfillment lies in leveraging your success to uplift others.

I commend the dedicated volunteers and contributors who bring this wonderful publication to life each year. May these pages spark conversations, ignite new ideas, and strengthen the bonds that make our community so special.

Happy reading!

Mr. Rahul Roy

Serial Entrepreneur and Philanthropist

‘"বাজলো তোমার আলোর বেণু"

Dear Friends and Community Members,

As we gather once again to celebrate Durga Puja, one of the most cherished festivals in our tradition, I am filled with immense gratitude for the strength and unity of our community here in the San Francisco Bay Area. This sacred time reminds us not only of the triumph of good over evil, but also of the enduring power of togetherness, compassion, and service.

Over the past year, Prabasi has continued its mission of cultural preservation and social responsibility. With your support, we have carried forward several philanthropic initiatives that remain close to our hearts:
Supporting educational programs and scholarships for underprivileged students in India and the U.S.
Providing humanitarian aid during natural disasters, both locally and abroad.
Partnering with local food banks and shelters in the Bay Area to extend a helping hand to those in need. Creating platforms for youth engagement, cultural awareness, and leadership development.

These efforts are possible only because of your commitment and generosity. Together, we ensure that the values embodied in Durga Puja—courage, resilience, and compassion—shine far beyond our celebrations.

This year, however, we also carry a deep sense of loss. We mourn the untimely passing of our respected Board Member, Mr. Abhijit Datta, whose energy, vision, and unwavering commitment enriched Prabasi in countless ways. We also remember with reverence Mr. Ramen Chakraborti, a founding member of Prabasi, whose dedication helped lay the very foundation of this organization more than four decades ago. Their legacies will continue to inspire us as we move forward.
As we seek Maa Durga’s blessings during this festive season, let us honor their memory by reaffirming our commitment to community, service, and cultural enrichment.
On behalf of the entire Board of Directors, I wish you and your family a joyful, safe, and blessed Durga Puja. May the divine presence of Maa Durga fill your hearts with strength, peace, and happiness.

With warm regards and gratitude,

Sudipto Mukhopadhay **(Chairman/President)**

AURUM

SINCE 2020

THE INDIAN JEWEL

CATERING

Scan Here

Our Services:

- Weddings
- Dinner Parties
- Corporate Events
- Lunches / Office Meetings

Contact Us

(650)-383-5221

https://aurumca.com/

132 State St. Los Altos, CA, 94022

TAJ MAHAL
FLAVORS OF INDIA
LIVERMORE
TAJ MAHAL LIVERMORE
WHERE Elegance meets EXCELLENCE
DINE -IN
CATERING FOR EVENTS
TAKE OUT
SAN FRANCISCO BAY AREA
BOOK NOW
4705 LIVERMORE OUTLETS DR. LIVERMORE, CA 94551 |
TAJMAHALFLAVORSOFINDIA.COM

শারদীয়া ১৪৩২
সেপ্টেম্বর ২০২৫

সম্পাদকের কলমে ২

সাক্ষাৎকার

অভিনেতা অনির্বাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে কথোপকথনে
সুদেষ্ণা গোস্বামী ৯

কবিতা

একটি গ্রে-সেক্সুয়াল মেয়ের সঙ্গে – সুবোধ সরকার ৪৩
তারপর – স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ৪৪
একটি মেয়ের কাহিনী - মঞ্জুশ্রী সেন ৪৫
মা, বাবা ও অভাগিনী - অরুণাশিস সোম ৪৬
মিথ্যে - অরুণাশিস সোম ৪৬
সুন্দরী নায়াগ্রা - নিরঞ্জন রায় ৪৭
লম্বা - বসুন্ধরা মিত্র ৪৭
ছিঃ ! - অমিতাভ বসু ৬০

পুরাণ কথা

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা – দেবাশিস পাঠক ৩

রম্যরচনা

জয় মা দুর্গা – বিশ্বনাথ বসু ৪৫
১৪ মার্চ – রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮
আড্ডা – সুমন সেনগুপ্ত ৫০

গল্প

তৃতীয় ব্যক্তি – শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ২২
শিল্পী সন্তুর গল্প – প্রচেত গুপ্ত ২৪
অতিমারি – সিজার বাগচী ২৯
হুডানিট – ইন্দ্রনীল সান্যাল ৩৬
রূপসজ্জা - বসুন্ধরা মিত্র ৫৮

সম্পাদক : উল্লাস মল্লিক
সমন্বয় সাধন : দীপঙ্কর সেন

সহযোগিতায় : লিপি চক্রবর্তী,
কৌশিক মুখার্জি

অঙ্কন : অভি

একটা বছর পেরিয়ে আবার এলাম উৎসবের দ্বারে। দেখতে দেখতে কখন যেন নিজে নিজেই একটা পাক খেয়ে নিল আমাদের প্রিয় এই গ্রহটা।

আমাদের উমা মা কৈলাস থেকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত। আমরাও প্রস্তুত হচ্ছি তাঁকে বরণ করার জন্য। যদিও এবার বর্ষা দীর্ঘায়িত। প্রকৃতি এখনও নীল আকাশ, হালকা সাদা মেঘ আর ফুরফুরে কাশফুল নিয়ে সেজে ওঠেনি। এখনো আকাশে কালো গাম্ভারি মেঘের দল যখন তখন গুরুগম্ভীর শব্দে অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। প্রবল বর্ষণ ধুইয়ে দিচ্ছে চারপাশ। আশা করছি বোধনের আগেই বিদায় নেবে বর্ষা। প্রকটিত হবে শরৎ। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, রোদে সোনালি আভা, বাতাসে খুশির ছোঁয়া। ঠিক যেমন পরিবেশে মর্ত্যে পা রাখেন উমা মা।

এরই পাশাপাশি কাজ চলছে শারদ সাহিত্যের। কত পুজোসংখ্যা যে বেরোয় এই পুজোকে কেন্দ্র করে। একটা উৎসবকে কেন্দ্র করে এত বিপুল পরিমাণ সাহিত্য সৃষ্টি আর কোনও ভাষায় হয় বলে জানা নেই আমার। এবছরও প্রবাসী থাকছে তার সাহিত্য সম্ভার নিয়ে। নবীন থেকে প্রবীণ---একদল সাহিত্যকারের সৃষ্টি নিয়ে মালা গেঁথেছি আমরা। আপনাদের ভাল লাগলে আমাদের উদ্যোগ সফল।

সবাই ভাল থাকবেন। আনন্দে থাকবেন। উৎসবে থাকবেন। নমস্কার।

উল্লাস মল্লিক
সম্পাদক
প্রবাসী (বে-এরিয়া)

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা

দেবাশিস পাঠক

দুর্গা। এই নামটি এল কোথা থেকে?
দুর্গতি নাশ করেন তিনি। তাই-ই তিনি দুর্গা। এমন একটা ধারণা সাধারণ্যে প্রচলিত। পুরাণ কিন্তু অন্য কথা বলছে।

দেবী ভাগবত অনুসারে, হিরণ্যকশিপুর ভাই হিরণ্যাক্ষ। তাঁকেও বিষ্ণু মেরেছিলেন বরাহ অবতারে। দাঁত দিয়ে। আর হিরণ্যকশিপুকে মারলেন নখ দিয়ে। নৃসিংহ অবতারে। এই দৈত্য বংশেই জন্ম নিয়েছিল দুর্গম। বিন্ধ্যাচলের মতো দুর্গম জায়গায় বাস করত সে। আর পূর্ব পুরুষদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সেখান থেকেই দেবতাদের রাজপাট, বৈদিক সংস্কৃতি, সব কিছু বিপন্ন করে তুলল। দেবতারা যে তাকে হত্যা করবেন তার পূর্বসূরীদের মতো, সে উপায় ছিল না ব্রহ্মার সৌজন্যে। ব্রহ্মা চিরকালই উদারহৃদয়। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে দেব দানব সবার প্রতিই প্রসন্ন হৃদয়। তপস্যায় তুষ্ট করতে পারলে বরদানে বঞ্চিত করেন না কারওকেই। দুর্গম অসুরও পেয়েছিল ব্রহ্মার বর। ত্রিলোকে কেউ তাকে মারতে পারবে না, যদি না সে এমন নারী হয়, যে অনাবদ্ধকে আবদ্ধ করতে পটু। অতএব দুর্গম নিধনের জন্য দেবতারা শরণাপন্ন হয়েছিলেন নারী শক্তিরই। তাঁর হাতেই নিহত হয় দুর্গম। অবসান হয় আসুরিক অনাচারের। আর সেই নারী শক্তি, দুর্গম নিধনের কারণে দুর্গা নামে পরিচিতা হন। দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা।

তবে ভক্তি অত পণ্ডিতির পথে চলে না। তার পথটি অত শাস্ত্র পুরাণের গলি ঘুঁজি চেনে না। সে পথটি সহজ এবং সরল। তাই, সে মাতৃ নামের আড়াল আবডালে

থেকেই চিনে নেয় নির্দিষ্ট রসদ। তাঁর প্রাণের, তাঁর চৈতন্যের। তাই শাস্ত্র লিখল ---

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত।।
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।।

অর্থাৎ, 'দ' অক্ষরটি দৈত্য বিনাশ করে, উ-কার বিঘ্ন নাশ করে, রেফ রোগ নাশ করে, 'গ' অক্ষরটি পাপ নাশ করে এবং অ-কার শত্রু নাশ করে। এর অর্থ, দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা।

অক্ষরে অক্ষরে ভক্তির উদগীরণ। ইচ্ছা পূরণের ইঙ্গিত। অশুভ বিনাশী সংকেত।

শরতে দুর্গা পুজোর শুরুটা কবে থেকে? মানে, ঠিক কোন তিথি থেকে শারদ উৎসবের সূচনা মুহূর্ত সংকেতিত?

এ নিয়েও মতান্তর অনর্গল।

উল্লিখিত প্রশ্নের অবধারিত উত্তর, মহালয়া। মানে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের অমাবস্যা তিথি। আজ থেকে অর্ধ শতাধিক বছর আগে, আমাদের ছোটবেলায় অত পঞ্জিকা, তিথি, শুভাশুভ নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন অনুভব করতাম না। বাবাকে দেখতাম, তর্পণ করার জন্য গঙ্গার ঘাটের দিকে রওনা দিতেন। তার আগে বাড়ির সক্কলের সঙ্গে রেডিওতে মহিষাসুরমর্দিনী শুনতেন। আর ওই অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠে 'আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জীর, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা' শোনামাত্র আমাদের দুর্গাপুজো শুরু হয়ে যেত।

এখন, অর্ধশতাধিক বছর পর, ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ শাসিত ধরণীতে জানছি, দুর্গাপুজোর সঙ্গে মহালয়ার কোনও যোগ নেই। মহালয়া শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানের মতো, তর্পণ ইত্যাদির মতো পারলৌকিক কৃত্য সম্পাদনের তিথি। আর, দুর্গাপূজা আনন্দ-উৎসব। এ দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজতে চাওয়া নাকি শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম। স্রেফ মহালয়ার সকালে বেতারে চণ্ডীপাঠ সম্প্রচারের কারণে নাকি মহালয়া দুর্গোৎসবের পরিধিতে ঢুকে পড়েছে। এ নিয়ে ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে বিস্তর তর্কবিতর্ক, পণ্ডিতম্মন্যদের আকচা-আকচি।

যাঁরা এই মতের প্রচারক তাঁরা সংস্কৃতিমনা হতে পারেন, শাস্ত্রজ্ঞ নন। আবার যাঁরা এই মতের বিরুদ্ধাচরণ করছেন, তাঁরাও আবেগে টগবগ করতে পারেন, পুরাণ নিয়ে চর্চার সুযোগ বড় একটা পান না। এই দুই নেতির কারণে যেটা আড়ালে চলে যাচ্ছে সেটি একটি পৌরাণিক সত্য। শাস্ত্রসিদ্ধ বিষয়।

সেটা হল, দেবী দুর্গার আবির্ভাবের সঙ্গে মহালয়ার যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। এবং বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানেও সেকথা অনুক্ত থাকে না, কিন্তু গুরুত্ব অর্জনে ব্যর্থ হয়।

আমরা বছরের পর বছর ধরে শুনছি, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলছেন, 'দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী, তিনি কন্যাকুমারী আখ্যাতা দুর্গি। তিনিই আদিশক্তি আগমপ্রসিদ্ধমূর্তিধারী দুর্গা, তিনি দাক্ষায়ণী সতী।' অথচ জানছি না, কিংবা জানানোর চেষ্টা করছি না, কালিকাপুরাণ অনুসারে, এই কাত্যায়ন কন্যা কাত্যায়নীর আবির্ভাব তিথিটি হল ঠিক মহালয়ার আগের দিন। অর্থাৎ, আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। কালিকাপুরাণের ষাটতম অধ্যায় বলছে, 'দেবতাদের তেজোরাশি হইতে উপজাতশরীরা দেবী কাত্যায়ন কর্তৃক প্রথমে সন্ধুক্ষিত এবং পূজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে কাত্যায়নী বলা হয়। তাহার পর সেই দশভুজা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী মহাদেবী, মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছিলেন। সেই মহাদেবী দেবগণ কর্তৃক সংস্তুত এবং প্রবোধিত হইয়া, আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর দিনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুশোভন শুক্লপক্ষের সপ্তমীর দিবস দেবগণের তেজে সেই দেবীমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। অষ্টমীতে দেবগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিয়া ছিলেন। নবমীতে দেবী নানাবিধ উপহার দ্বারা পূজিত হইয়া মহিষাসুরকে নিহত করেন এবং দশমীতে দেবগণ কর্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া অন্তর্ধান করিলেন।' (৭৭ - ৮১ নং শ্লোক; পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত বঙ্গানুবাদ।)
অস্যার্থ, মহালয়াকে দুর্গোৎসবের পরিধি থেকে বাদ দিলে দেবীর আবির্ভাবের তিথিটিই বিসর্জিত হবে।
ইদানিং আবার পণ্ডিতাভিমানী রাজনীতিকরা ফেসবুক ও হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপের আশ্রয়ে মহালয়াকেন্দ্রিক একটি নতুন বক্তব্য ছড়িয়ে দিতে তৎপর হয়েছেন।

এতদিন পণ্ডিতম্মন্য শাস্ত্রজ্ঞানশূন্যের দল বলে আসছিলেন, মহালয়া দুর্গাপূজার সঙ্গে সম্পর্করহিত একটি তিথি। আর এখন রাজনীতির আশ্রয়ে ধর্মধ্বজী হওয়ার প্রণোদনায় অনেকে প্রচার শুরু করেছেন, মহালয়ার আগে দুর্গাপুজোর উদ্বোধন শাস্ত্রবিরোধী কর্ম। এমন অশাস্ত্রীয় কর্মের কারণে সনাতন ধর্ম একেবারে রসাতলে যেতে বসেছে।

বলতে বাধা নেই, মহালয়াকে দুর্গা পুজোর সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বলে প্রচার করাটা যতটা অশাস্ত্রীয়, মহালয়ার

আগে পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার বিরোধিতাও ততটাই অশাস্ত্রীয়, এমনকী অনৈতিহাসিক সংনমন।

রঘুনন্দনের দুর্গোৎসব তত্ত্বে শারদীয় দুর্গা কেন্দ্রিক উৎসবের ছ'টি কল্প বিধান আছে। 'কল্প' শব্দটির দুটি অর্থ। এক অর্থে 'কল্প' হল যুগ বা সময়কাল। অপর অর্থে 'কল্প' হল 'বৈধ আচার', অর্থাৎ ব্রত পালন যা যজ্ঞানুষ্ঠানের তুলনায় ঈষৎ ন্যূন। দুর্গোৎসবের ছ'টি কল্প এরকম :

১। কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প : এই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাবেলায় বেলগাছের ডালে দেবীর বোধন হয়। তারপর আমন্ত্রণ ও অধিবাস। 'অধিবাস'-এর অর্থ 'মাঙ্গলিক দ্রব্যের দ্বারা সংস্কার। এইভাবে দেবী পূজার সূচনা ঘটে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণানবমীতে। পরের পনেরো দিন ধরে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২। প্রতিপদাদিকল্প : এই কল্প অনুসারে দেবীর বোধন হয় আশ্বিনের শুক্লা প্রতিপদে। তারপর অর্থাৎ মহালয়ার পর ন'টি রাত্রি ধরে দেবীর অর্চনা করা হয়। এই কল্পই হল নবরাত্রি ব্রত।

৩। ষষ্ঠ্যাদি কল্প : এটির সঙ্গে আমরা সর্বাধিক পরিচিত। এই কল্প অনুসারে ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন, তারপর তিন দিন, সব মিলিয়ে চারদিন ধরে দেবীর পূজা হয়।

৪। সপ্তম্যাদি কল্প : এই কল্পের প্রধান আচার নব পত্রিকার স্নান। সমবেতভাবে নব পত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা। কিন্তু এর এক একটি উদ্ভিদ দেবীর এক একটি রূপের প্রতীক। কলা থেকে কচু, হলুদ থেকে ডালিম, অশোক থেকে মানকচু, জয়ন্তী থেকে বেল, আর লক্ষ্মীস্বরূপা ধান তো আছেই, এই ন'টি উদ্ভিদ অপরাজিতা লতা আর হলুদ রংয়ের সুতো দিয়ে বেঁধে পুজো করা হয়। এই পুজো আদতে কৃষিভিত্তিক সমাজে পৃথ্বীদেবীর পুজো পরম্পরা।

৫। মহাষ্টম্যাদি কল্প : এক্ষেত্রে প্রথমেই লক্ষণীয় 'অষ্টমী'র আগে 'মহা' শব্দটির অবস্থান। ষষ্ঠী বা সপ্তমীর আগে এই বিশেষণ বসেনি। অষ্টমী মহাষ্টমী কারণ এদিনকার পুজো মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। মহাবিপত্তারক এই পূজা অনুষ্ঠান।

৬। মহানবমী কল্প : এক্ষেত্রেও 'মহা' জুড়েছে 'নবমী'র আগে। কারণ, নবমীর পুজো 'মহাসম্পদ্দায়ক', প্রচুর সম্পত্তি প্রদান করে।

অর্থাৎ, প্রতিপদাদিকল্প অনুসারে, মহালয়া দুর্গোৎসবের পরিধিভুক্ত তিথি। এই শাস্ত্র সম্মত বিধিটি বেতারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের চণ্ডী পাঠের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের বহু আগে সমাজ সম্মত আচার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৩২২ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের কার্তিক সংখ্যার 'নারায়ণ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। শিরোনাম "শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব", লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নারায়ণ '- এর সম্পাদক তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেই প্রবন্ধে লেখা আছে, 'দেবীপক্ষের পূর্বেই পিতৃপক্ষ...যাঁহারা শাক্ত, তাঁহারা ... পিতৃপক্ষের নবমী তিথি হইতে ... বোধন বসাইয়া থাকেন... নবম্যাদি কল্পকে সাক্ষী বোধন বলে, অর্থাৎ তিলাঞ্জলি পরিতৃপ্ত পিতৃগণ উপস্থিত থাকিয়া এই কল্পের সহায়তা করেন, তাঁহারা যেন দাঁড়াইয়া থাকিয়া কুণ্ডলিনী জাগরণের সুবিধা করিয়া দেন। বংশানুক্রমের প্রভাবে এ দেহ তো তাঁহাদেরই, তাঁহাদের পাপ পুণ্য দোষ গুণ এবং অন্য বিশিষ্টতা সকলই এ দেহে সূক্ষ্ম বা প্রকটভাবে বিরাজ করিতেছে, তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া বোধনের সহায়তা করিলে মা ... দেহঘটে এবং বিশ্বঘটে স্বেচ্ছায় জাগিয়া বসেন, তিনি জাগিলে ...সকল সাধ পূর্ণ হয়।... সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পরমাত্মাস্বরূপের দর্শন হয়। এই জাগরণই দুর্গোৎসবের সাধনা, আসল পূজা, আসল আরাধনা। এই জাগরণ দেহভাণ্ডে এবং ব্রহ্মাণ্ডে ঘটে এবং পটে সাধন করিতে হয়।' এক কথায়, পিতৃপক্ষ বলে দেবী পুজো শুরু করা যাবে না, এমন মত আদৌ শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। বরং পিতৃপক্ষ থাকাকালীন দেবীর বোধন শাস্ত্র অনুমোদিত কর্ম।

ইতিহাসেরও এই অনুমোদনের প্রতি পক্ষপাত স্পষ্ট। কলকাতায় দুর্গাপুজোর ইতিহাস তেমনটাই বলছে। কলকাতায় প্রথম শারদীয় দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় সেই বছর, যে বছর পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের পরাজয় ঘটল। ইংরেজরা জিতল সেই যুদ্ধে আর লর্ড ক্লাইভের প্রত্যক্ষ মদতে পলাশির জয়ের স্মারক উৎসব হিসেবে পালিত হল দুর্গাপুজো শোভাবাজারের রাজবাড়িতে। পুজো সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন নবকৃষ্ণ মুনশি। এর প্রায় ১১ বছর পর, ১৭৬৬ সালে তিনি 'মহারাজা বাহাদুর' হন। নবকৃষ্ণ সেবার দেবী পুজোর বোধন করেছিলেন মহালয়ার আগের নবমীতে। পুজো চলেছিল ১৫ দিন। এই ক'দিন প্রত্যেক সকালে চণ্ডী পাঠের আসর বসত। আর রাতে বসত নাচ-গান-মদের আসর।

সোজা কথায়, মহালয়াকে দুর্গাপুজো থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতো বিষয়ে পুরাণ সমর্থন দেয় না বটে, তবে মহালয়ার আগেই দুর্গাপুজোর বোধনের ঘটনা শাস্ত্র ও ইতিহাস সমর্থন করে।

এর থেকে কী বোঝা গেল? সেই প্রশ্নের উত্তরও রয়েছে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত প্রবন্ধের একটি বাক্যে। পাঁচকড়ি লিখছেন, 'খোশ খেয়ালের কাব্য জড়াইয়া এই মহামহোৎসবের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিলেই অজ্ঞতা এবং মূর্খতা আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিবে।'

মা দুর্গার 'ছানাপোনা' নিয়ে মর্ত্যে আগমনের সাক্ষী থাকতে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ভিড় ও সেই সূত্রে জ্যাম-জটের ট্র্যাডিশনটাও মোটেই অর্বাচীন কালের আদিখ্যেতা নয়। বরং দ্বিশতাধিক বর্ষের পুরোনো পরম্পরা। ১৮৩২-এর 'সমাচার চন্দ্রিকা' জানাচ্ছে, 'গোপীমোহন ঠাকুর ও মহারাজা সুখময় রায়বাহাদুর ও বাবু নিমাইচরণ মল্লিক প্রভৃতির বাটীর সম্মুখে রাস্তায় প্রায় পূজায় তিন রাত্রিতে পদব্রজে লোকের গমনাগমন ভার ছিল যেহেতু ইংরেজ প্রভৃতি লোকের শকটাদির ও যানবাহনের বহুল বাহুল্যে পথ রোধ হইত।' কলকাতার বড় বড় পুজো প্যাণ্ডেলের আশেপাশে চেনা যানজটের সেপিয়া রঙে ছুপানো প্রাচীন চিত্র বই অন্য কিছু নয়।

একই রকম কথা, দুর্গা পুজোয় মদ্যপান কেতায় কিংবা ভাসানের সময় নাচ গান বেলেল্লাপনার মধ্যে শাস্ত্রীয় বিধির উল্লঙ্ঘন আশঙ্কার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১৯৩৩-এ 'ইয়ং বেঙ্গল' জানতে চেয়েছিল, দেশীয় বাবুরা প্রজা সাধারণের উন্নতিকল্পে ইংরেজ সাহেবদের সাহায্য না-নিয়ে দুর্গা পুজোয় তাঁদের মদ খাইয়ে, নাচ দেখিয়ে টাকা ওড়াচ্ছেন কেন? 'তাহারা কি সর্বসাধারণের উপকারযোগ্য কোন বিষয় দেখিতে পান না?' ঈশ্বরগুপ্তও এরকম 'সৎ' জিজ্ঞাসা তুলতে কার্পণ্য করেননি। তিনিও সরাসরি শুধিয়েছিলেন,

'পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ যথা।
ঈশু কৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা।।
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে।
দেবীপূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে।।'

'ভাসানযাত্রা'য় 'তাসা পার্টির কসরত' দেখানোর প্রসঙ্গ। এটিও বোধহয়, আর যাই হোক, অশাস্ত্রীয় জ্ঞানে বর্জ্য নয়। শাস্ত্রের বিধান, বিসর্জনের সময় দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি শবরোৎসবের আঙ্গিকে বিসর্জিত হবে। শাস্ত্রমতে, কাদা ছোঁড়াছুড়ি খেলা থেকে শুরু করে অশ্লীল নাচ, সবকিছুই ওই শবর উৎসবের অঙ্গ। আসলে দশমী, মুক্তিসুখে অবগাহনের দিন। 'যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রত চ' (শ্রীশ্রী চণ্ডী ৪/৯)। সেই মুক্তিসুখে লেপ্টে থাকে শবোরৎসব। অন্ত্যজ শবর সম্প্রদায়ের পালনযোগ্য উৎসব। স্মৃতিশাস্ত্র প্রণোদিত করছে, দেবীর নিরঞ্জন হয়ে যাওয়ার পর 'ভগলিঙ্গাভিধান' দিয়ে, অর্থাৎ অশ্লীল শব্দ সহযোগে, একে অন্যকে গালিগালাজ করার জন্য। সেইসঙ্গে সারা শরীর পাতা দিয়ে ঢেকে, সারা গায়ে কাদা মেখে নাচ গান করতে। যে এরকম করবে না, যে এসবে অংশ নেবে না, তারা দেবীর 'বিরাগভাজন' হবে, একথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, সামাজিক শ্রেণি বিন্যাসে তুমি যে স্তরেই বিরাজ কর, দশমীর দিন বিসর্জন শেষে উচ্চ বর্ণীয়দের ডি-ক্লাস হতেই হবে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে।

সেজন্যই বোধহয় ১৯০১ সালে বেলুর মঠে প্রথম দুর্গাপুজোর সময় প্রতিমা নিরঞ্জনের আগে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং দেবী প্রতিমার সামনে ভাবের ঘোরে নেচে উঠেছিলেন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করেছিলেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। আর আজও বেলুড় মঠের সাধুরা প্রতিমা বিসর্জনের সময় টুইস্ট নেচে নেন। তাসা পার্টির কসরতও এই ধারারই আধুনিক প্রকাশ, এটা অস্বীকার করব কোন যুক্তিতে?

দেবী দুর্গার সৃষ্টিতে আসলে লুকিয়ে আছে পদার্থ বিদ্যার একটি সূত্র। পদার্থ বিজ্ঞান অনুসারে, বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হচ্ছে ভর ও শক্তিকে অভিন্নরূপে দেখা। ভরের সঙ্গে যেমন শক্তি জড়িত, তেমনি শক্তির সঙ্গে ভর জড়িত। অর্থাৎ আপেক্ষিকতার তত্ত্বে ভর ও শক্তিকে একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলে প্রমাণ করা যায়। $E = mc2$ আইনস্টাইনের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সর্বাধিক পরিচিত সমীকরণ। সমীকরণটিতে ভর ও শক্তির মধ্যেকার এই পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুসারে ভর সমপরিমাণ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। যার সাধারণ মানে দাঁড়ায় ভর এবং শক্তি পরস্পরে রূপান্তরিত হতে পারে। এই সাম্য অনুযায়ী, ভর এবং শক্তি হল আন্তঃরূপান্তরযোগ্য। অন্য কথায় ভর এবং শক্তি একই ভৌত সত্তা এবং একে অপর রূপে পরিবর্তিত হতে পারে।

ভরের শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ ভৌত বিজ্ঞানে বহু। এই সংক্রান্ত সর্বাধিক পরিচিত এবং বেদনাদায়ক উদাহরণটি হল হিরোশিমা-নাগাসাকিতে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৮ আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেলা পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। পারমাণবিক বোমাতে একটি বড় মৌলের পরমাণুকে (যেমনঃ- ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম) নিউট্রন দ্বারা আঘাত করে ভেঙে ফেলা হয়। ফলে বড় পরমাণুটি ভেঙে দুইটি নতুন পরমাণুতে বিভক্ত হয় এবং কিছু ভর পরিণত হয় শক্তিতে। কিন্তু শক্তির ভরে রূপান্তরিত হওয়ার উদাহরণ

আমাদের চারপাশে বড় একটা নেই।

এই প্রেক্ষিতে দেবতাদের পুঞ্জীভূত তেজ ঘনীভূত ভর হিসেবে দুর্গার আবির্ভাব শক্তির ভরে পরিণত হওয়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য হতে পারে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই কাহিনী $E = mc2$ প্রচারিত হওয়ার বহু শতাব্দী আগে ঋষি হৃদয়ে, ভাবনেত্রে পরিস্ফুট হয়ে গিয়েছিল।

পরিশেষে বলি, দেবী দুর্গা কোনও দুর্জ্ঞেয় বিষয় নন। বরং দুর্গা তত্ত্ব এমন একটি বিষয় যা অন্ধের কাছেও পরিস্ফুট হয় বিনা বাধায়। এ এক ঐতিহাসিক সত্য।

১০৭১ বঙ্গাব্দ। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলার আটিয়া পরগণার কাটালিয়া গ্রাম। নয়নকৃষ্ণ রায়ের ছেলে ভবানীপ্রসাদ। বৈদ্য বংশের জন্মান্ধ সন্তান।ছেলেবেলাতেই বাপ-মা'কে হারিয়ে অনাথ। পারিবারিক পদবি ছিল কর। কিন্তু বাবার মতো নয়নকৃষ্ণের জন্মান্ধ ছেলেও ব্যবহার করে 'রায়' উপাধি। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই তুতো-ভাই কাশীনাথের আশ্রিত সে। কাশীনাথের দুই ছেলে। দুজনেই কাকাটির ওপর অত্যাচার চালায়। ছোট ভাইপোর পর-নারী আর পর-দ্রব্যের প্রতি টান অনেকটা বেশি। ভবানীপ্রসাদের উপর নির্যাতনের বহরও। ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ বলে অক্ষর পরিচয়ের সুযোগ পায়নি। তাই সে নিরক্ষর। তা বলে মূর্খ নয়। মুখে মুখে, শুনে শুনে সে শিখে নিয়েছে পুরাণ। শ্রীশ্রী চণ্ডীর শ্লোক তার মনে বাজে। তাই অক্ষরজ্ঞানহীন দৃষ্টিশক্তিহীন কবি অক্লেশে লিখে ফেলেন, 'তুমি স্বাহা তুমি স্বধা তুমি বষটকার। তুমি মেধা তুমি মাত্রা তুমি সে আকার।।' একেবারে শ্রীশ্রী চণ্ডীর ৭৩ নং শ্লোকের ভাবানুবাদ। শ্রীশ্রী চণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ের ৭৩ নং শ্লোক।

'ত্বং স্বহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকারঃ স্বরাত্মিকা। সুধা তমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।।' অষ্টমীর সকাল। দুর্গা পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে নতুন জামা-কাপড়ের গন্ধ। ফুল বেলপাতা হাতে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করছেন ভক্তিভরে। সম্মিলিত কণ্ঠে পুরোহিতকে অনুসরণ করে অনুরণিত হচ্ছে সেই চির চেনা মন্ত্র, "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো'স্তুতে।। সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানং শক্তিভূতে সনাতনী। গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমো'স্তুতে।। শরণাগতদীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে। সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমো'স্তুতে।। 'শ্রীশ্রী চণ্ডী'র একাদশ অধ্যায়ে নারায়ণীস্তুতির ১০-১২ নং শ্লোক।

অন্ধ কবিও কানে শুনেছেন সেই শ্লোক। সেটিকে জারিত করেছেন অনুভবের রসে। তারপর তাঁর বঙ্গানুবাদে আলপনা এঁকেছে ভাবের সহজিয়া ছন্দ। 'সর্বমঙ্গলা রূপে তুমি কল্যাণদায়িনী। শিবারূপে চতুর্বর্গ ফল প্রদায়িনী। সৃষ্টিস্থিতি উৎপত্তি পালন যাহার। শক্তিরূপে রচ তুমি মূল সবাকার।। শরণাগতের দুঃখ খণ্ডন কারণ। পরিত্রাণ কর তুমি হৈয়া পরায়ণ।।'

এই অধ্যায়েই ইন্দ্রসহ দেবতারা উচ্চারণ করেছেন স্তোত্র, 'সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তি সমন্বিতে। ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমো'স্তুতে।।' ভবানীপ্রসাদও তখন কাতরভাবে প্রণতি জ্ঞাপন করেছেন, বাংলা ভাষায়, সংস্কৃতের জটা ছাড়ানো সারল্যে। 'সর্বস্বরূপা তুমি সর্বদেবময়ী। আদ্যারূপা জীবে বাস করহ নিশ্চএ।। সর্বশক্তিময়ী তুমি সর্বত্রসমান। সেহি মায়া-মোহে জীব নাহি অন্য জ্ঞান।।"

> দেবী দুর্গার সৃষ্টিতে আসলে লুকিয়ে আছে পদার্থবিদ্যার একটি সূত্র।
>
> পদার্থ বিজ্ঞান অনুসারে, বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হচ্ছে ভর ও শক্তিকে অভিন্নরূপে দেখা।

১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২৯ ভাদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনের বক্তৃতা দিতে উঠলেন রসিকচন্দ্র বসু। আর তাঁর আলোচনাতেই প্রথম উঠে এল 'দুর্গামঙ্গল' প্রসঙ্গ। ভবানীপ্রসাদ রায়ের কাব্য। কাব্যটির যে পুঁথি উদ্ধার হয়েছিল তাতে লেখা ছিল রচনা কাল। 'চন্দ্র মুনি আর দিক নিয়া সাথে। রচিল পুস্তক রায় প্রকাশ কবিতে।।"

এই কালনির্ণায়ক দ্বিপদীর প্রথম চরণেই দুটি বর্ণ কীটদষ্ট। পড়া যাচ্ছে না। রসিকচন্দ্র বসু পোকায় কাটা বর্ণদুটিকে 'দশ' ধরে নিয়ে রচনাকাল ১০৭১ (দশ দিক, সপ্ত ঋষি আর এক চন্দ্রের সমাহার) অব্দ নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু ১০৭১ কী, বঙ্গাব্দ, না শকাব্দ, সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি। তাঁর এই না-পারাটাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন 'দুর্গামঙ্গল'-এর সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তাফী। তিনি বলেছেন, 'দশ দিক'ই যে হতে হবে, তা তো আর নিশ্চিত করে বলা যায় না। পোকায় কাটা জায়গাটায় 'চার' শব্দটাও তো থাকতে পারত। তাহলে ১০৭১ বদলে যেত ১৪৭১-এ। এইভাবে 'দুর্গামঙ্গল'-এর রচনাকাল ১৪৭১ শকাব্দ, এমনটাই অভিমত ব্যোমকেশ মুস্তাফীর। সেক্ষেত্রে ভবানীপ্রসাদ

চৈতন্যযুগের প্রথম শতাব্দীর লোক।

রচনাকাল যাই হোক না কেন, জন্মান্ধ কবির পক্ষে শ্রীশ্রী চণ্ডী সামনে খুলে বসে তার অনুবাদ করতে বসা সম্ভব ছিল না। তিনি তা করেনওনি। চোখে দেখতে না পেলেও স্রেফ শুনে শুনে শাস্ত্র-পুরাণের নানা বিষয় তাঁর মনে গেঁথে গিয়েছিল। 'দুর্গামঙ্গল' লেখার সময় সেই মনোলোকটাই তাঁর দৃষ্টি-প্রতিবন্ধকতা খর্ব করেছিল। ব্যোমকেশ মুস্তাফীর ভাষায়, 'শুনিয়া শুনিয়া তিনি যে সকল শাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মনে সর্বদা জাগরুক থাকিত এবং বুদ্ধিবলে তিনি প্রয়োজনমতো আবশ্যকীয় স্থলে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিতেন।'

এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ সম্ভবত ভগবান শ্রীহরির পশুরাজ হরির রূপ ধারণ বৃত্তান্ত। এ কাহিনি, শ্রীশ্রী চণ্ডী যার অংশবিশেষ, সেই 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'-এর নয়। এটি মৎস্য পুরাণের কাহিনি। এবং সে কথাটি জন্মান্ধ নিরক্ষর কবিবর স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন।

'ভগবতী বোলে হরি অবধান কর। যুদ্ধকামে পৃথিবী লহ সবে মোর ভর।। পদভরে পৃথিবী হইবে রসাতল। কি মতে অসুর সঙ্গে কবির সমর।। ধরিবারে আমাদের পারহ কোন জন। অসুর এই বধিতে পারি করিয়া সংগ্রাম।। এতেক শুনিয়া তবে বোলেন শ্রীহরি। অবশ্য ধরিব আমি সিংহমূর্তি ধরি।। এ বোলিয়া সিংহমূর্তি ধরিলা নারায়ণ। বক্রনখ দন্ত হৈল বিকটভূষণ।। শটাতে নক্ষত্রলোক করয়ে বিদার। মহা পরাক্রম বীর কি কহিব আর।। এহিমতে ঐরিমূর্তি করিলা প্রচার। মৎস্যপুরাণে আছে ইহার বিস্তার।।'

'দুর্গামঙ্গল' কাব্যের আরম্ভটাও কিন্তু মোটেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'শ্রীশ্রী চণ্ডী'র অনুসারী নয়। ভবানীপ্রসাদ তাঁর কাব্য শুরু করেছেন শ্রীরামচন্দ্রের কথা দিয়ে। সমুদ্র লঙ্ঘনে অসমর্থ বানরসেনারা। অথচ সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় না পৌঁছাতে পারলে সীতা-উদ্ধার সম্ভব নয়। তখন জাম্বুবানের পরামর্শে রামচন্দ্র ডেকে পাঠালেন অগস্ত্য মুনিকে। অগস্ত্য এর আগে একবার এক অঞ্জলিতে সমুদ্রের সমস্ত জল পান করেছিলেন। এবার আর সেকাজ করতে রাজি হলেন না। বললেন, 'পুনঃ পুনঃ নীর পান উচিত না হয়। অপরাধ বিনে কিছু পুণ্য নাশ হয়।।' সেই সঙ্গে পরামর্শ দিলেন, অম্বিকা পূজার। 'পরাৎপর পরব্রহ্মা দেবী মহাশয়া। ভজহ ভবানী-পদ ঐকান্তিক হৈয়া।। করিলে অম্বিকা পূজা সর্বাসিদ্ধি হয়। হেলায় বান্ধিবে সেতু লঙ্কা হবে জয়।।' রাম তখন জানতে চাইলেন দেবী পূজার বিধান। ক্ষত্রিয় তিনি। তাই দুর্গাপুজোর আচার-উপাচার তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। রামকে দুর্গাপুজোর আচার-উপাচার জানাতে গিয়ে অগস্ত্য তুললেন মেধস মুনির আশ্রমে রাজা সুরথ আর বৈশ্য সমাধির প্রসঙ্গ। জানালেন, কীভাবে সুরথ রাজা দেবী পূজা করে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করেছিলেন। সেই সূত্রেই মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রী শ্রী চণ্ডী অনূদিত হয়ে ঢুকে পড়ল কৃত্তিবাসী রামায়ণের অকাল বোধনের কাহিনির পরিসরে।

কাহিনি বিন্যাসে মৌলিকত্ব শুধু এটুকুতেই সীমায়িত নয়। মোচড় অন্যত্র। পূজা অন্তে রাম যখন সশরীরে আবির্ভূতা দেবীর কাছে রাবণ-নিধনের বর প্রার্থনা করলেন, তখন দেবী, ভবানীপ্রসাদের 'দুর্গামঙ্গল'-এ বলেন, তাঁর প্রিয় ভক্ত রাবণ কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করে ভুবন বিজয়ী বীর হয়েছেন। সুতরাং 'তাহাকে জিনিতে আমি কিমতে দিব বর।' রামচন্দ্র দেবীর অসহায়তাটা বুঝেছেন। এবং বলেছেন, 'আর বরে নাহি প্রয়োজন। নিশ্চয় বধিব আমি লঙ্কার রাবণ।।' এ একেবারে আম-বাঙালির মনোলোকের প্রতিফলন। পূর্ণ দৈবনির্ভরতা নয়, বরং দেবতার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভক্তির সমান্তরালে আত্মনির্ভরতায় আস্থা জ্ঞাপন। এক্কেবারে 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা', বরং 'দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা', সেদিন ঈশ্বরের প্রতি সংশয়াতীত ভক্তি অটুট রাখার শপথ। কৃত্তিবাসের দেবনির্ভর, অলৌকিকতার ভিখারি রাম ভবানীপ্রসাদের কাব্যে ভক্তিমান অথচ প্রত্যয়ী পুরুষাকারের প্রতিভূ। দেবে ভক্তি অটুট রেখেই বারুদ শুকনো রাখার বাস্তব বোধে সম্পৃক্তি।

আসলে, জন্ম ইস্তক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভবানীপ্রসাদ ভাইপোদের হাতে নিগৃহীত হতে হতেও আস্থা রেখেছিলেন নিজের আন্তরসত্তার উপর, তাবলে ঐশ্বরিক কৃপা প্রার্থনায় যতি টানেননি। অন্ধত্ব ও নিরক্ষরতা সত্ত্বেও কাব্য রচনা করেছেন নিজের মনোবলে, আবার সেই কাব্য-আখরেই উজাড় করে দিয়েছেন তাঁর অকুণ্ঠিত দৈব নির্ভরতা।

ভবানীপ্রসাদ বলে ভবানীর পায়।
জন্ম অন্ধ ভগবতি কৈয়াছ আমায়।।
এ জনমের মত মোর নহিবে মোচন।
কৃপা করি আসি অন্ধে কর পরিত্রাণ।।

দৈবপ্রসাদে দুর্ভাগ্য অতিক্রম অসম্ভব জেনেও যে যুক্তিবাদী বাঙালি আমাদের মতো প্রতি বছর মণ্ডপে মণ্ডপে অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করে দুর্গার দুর্গতিহরণ ক্ষমতায়, ভবানীপ্রসাদ যেন তাদেরই প্রতিনিধি। আমাদের চির চাওয়া তো একটাই ---

সংসারার্ণবে দুষ্পারে সর্বসুখবিনাশিনী।
ত্রায়স্ব বরদে দেবী নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে।।

‘লোকে বলবে ওই যে...’

অনির্বাণ চক্রবর্তীর সঙ্গে অভিনয়-জীবন-দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায় সুদেষ্ণা গোস্বামী।

সুদেষ্ণা গোস্বামী

প্র : আপনার শৈশবের বেড়ে ওঠা আপনাকে অভিনেতা হিসাবে তৈরি হতে কতোটা সাহায্য করেছিল এবং সেটা আপনার শিল্পীসত্তাকে কীভাবে গড়ে তুলেছে ?

অনির্বাণ--- আমার ছোটবেলা কেটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বজবজে। মফস্বলের পরিবেশেই আমি বেড়ে উঠেছি। কলকাতার তুলনায় বজবজ অনেক দিক থেকেই আলাদা ছিল তখন।সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধাও অনেক কম ছিল। আমার মা বজবজের একটি স্কুলে শিক্ষিকা ছিলেন, সেই সূত্রেই আমাদের ওখানে থাকা। তবে আমার স্কুল ছিল কলকাতায়, রাজাবাজার এলাকায়। ফলে একটা দ্বৈত অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার—একদিকে মফস্বলের পরিবেশ, অন্যদিকে শহরের বাস্তবতা।

স্কুলে আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারতাম যে, আমি একটা আলাদা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছি। আমার টিফিন, আমার স্কুল ব্যাগ, এমনকি আমার কথাবার্তাও সহপাঠীদের থেকে কিছুটা আলাদা ছিল। তখন কলকাতার মধ্যবিত্ত ঘরের পরিবেশে যা চেহারা ছিল, আমাদের বাড়িতে তা ছিল না। আমার বন্ধুদের বাড়িতে যা খুব স্বাভাবিক, আমাদের পাড়ায় বা পাড়ার মধ্যবিত্ত পরিবারে তা ছিল বিরল। যেমন ফ্রিজ, টেলিভিশন—এই জিনিসগুলো আমাদের পাড়ায় খুব কমন ছিল না, কারও বাড়িতে থাকলে সবাই মিলে সেখানে গিয়ে দেখা হত। অন্যদিকে, আমাদের মফস্বলে চড়কের মেলা, রাসের উৎসব, পাড়ায় মিলেমিশে থাকা—এইসব অভিজ্ঞতা ছিল। আমি যৌথ পরিবারে না থাকলেও, আমাদের পাড়া ছিল একপ্রকার যৌথ পরিবারের মতো। প্রতিবেশীরা আত্মীয়ের

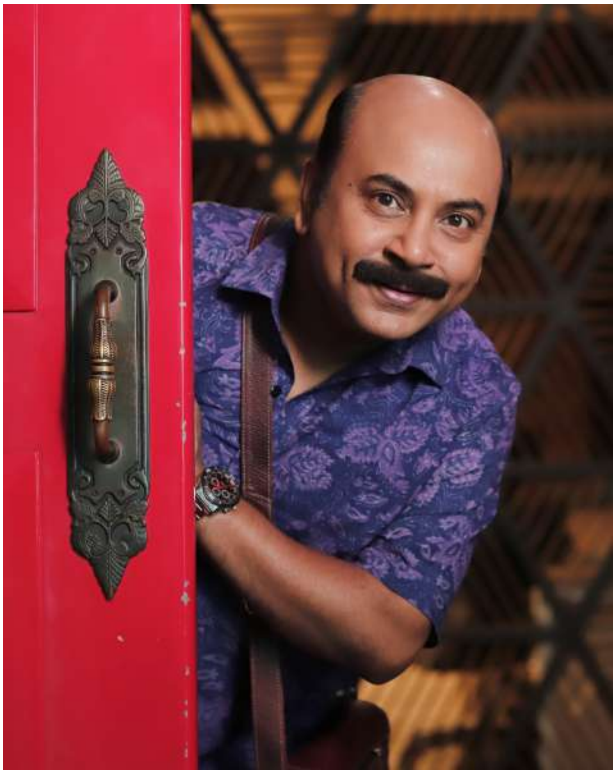

মতোই ছিলেন, আর পাড়ার বন্ধুরা ভাই-বোনের মতো। এই উন্মুক্ততা, মাঠে খেলা, পুকুরে স্নান—এই পরিবেশে বড় হওয়ার মধ্যে একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। জটিলতা তো সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু আমি বলি, শিল্পী হতে গেলে মনটাকে বড় করতে হয়। সেই বড় মন তৈরি করে পরিবেশ আর অভিজ্ঞতা।

এই ধরনের পরিবেশে বড় হওয়াটাই আমি মনে করি, আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তুলেছে। হয়তো এটা কোনও বড় বিষয় নয়, কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবে আমাকে মানুষের মধ্যে থাকা, জীবনের বৈচিত্র্য দেখা এবং সেই বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করতে শিখিয়েছে। আমি এখন বুঝি, একজন শিল্পীর জন্য এমন নিরপেক্ষতা ও গ্রহণযোগ্যতা খুব জরুরি।

আমার মনে হয়, আমি যদি শহরে বড় হতাম, তাহলে হয়তো আমি একেবারে আলাদা মানুষ হতাম। সেটা ভালো হত কি খারাপ, তা বলা যদিও মুশকিল। কিন্তু ওই মানুষটা আমি হতাম না—এটা নিশ্চিত। তবে বেশ বড় বয়স অবধি আমি অনেক কিছু মিস করেছি—কলকাতার থিয়েটার দেখার সুযোগ, বড় মঞ্চের প্রোডাকশন ইত্যাদি। আবার অনেক কিছু গেইন করেছি—যেমন মাটির কাছাকাছি থাকা, মফস্বলের সহজাত অভিজ্ঞতা, মানুষের আন্তরিকতা।

প্র : আপনি কি ছোটবেলা থেকেই অভিনেতা হতে চেয়েছিলেন?

অনির্বাণ : একদমই না। সেই সময় আমার চারপাশে কেউ ছিল না যাঁরা অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিচ্ছেন। আমাদের বাড়ির কেউ চাকরি ছাড়া অন্য কিছু করতেন না। শিল্প বা সংস্কৃতি ছিল শুধুই শখের জায়গায়। কেউ পেশাদার লেখক, শিল্পী, অভিনেতা --- এমন কাউকে আমি ছোট থেকে কখনও দেখিনি।

তবে ছোটবেলা থেকে আবৃত্তি করতাম, ছবি আঁকতাম, অভিনয় করতাম। কিন্তু কখনও মনে হয়নি, আমি বড় হয়ে অভিনেতা হব। সে রকম কোনও আদর্শ বা রোল মডেলই ছিল না আমার আশেপাশে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমি ভাবতাম, বড় হয়ে পড়াশোনা করে চাকরি করব। অভিনয়টা একটা ভালোলাগার জায়গায় ছিল, এই পর্যন্ত।

প্র : তাহলে অভিনয়কে পেশা হিসেবে নেওয়ার ইচ্ছেটা কীভাবে এল?

অনির্বাণ : অনেক পরে। আমি ক্লাস টুয়েলভে পড়ার সময় প্রথম সিরিয়াসলি অভিনয় করি নাটকে। সেটা একেবারেই কাকতালীয়ভাবে হয়। আমাদের বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে অনেক কিছু হত—শুধু বই পড়া নয়, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নাটক ইত্যাদি। সেই পরিবেশ থেকেই প্রথম থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই দিকে এগোনো শুরু হয়। কিন্তু সেটা একেবারেই ধাপে ধাপে হয়েছে, কোনও রকম প্ল্যান করে বা স্বপ্ন নিয়ে নয়।

প্র : প্রথম নাটকে অভিনয়ের সুযোগ কীভাবে এল?

অনির্বাণ : বজবজ পাবলিক লাইব্রেরিতে আমি আঁকার ক্লাসে যেতাম। একদিন সেখানে এক নাটকের জন্য শিশু চরিত্র খোঁজা হচ্ছিল। আমি তখন ক্লাস ফোরে পড়ি, কখনও অভিনয় করিনি, নাটকও দেখিনি ঠিকমতো। তবু আমি হাত তুলে দিয়েছিলাম। সম্ভবত ভিতরে কোথাও একটা টান বা ইচ্ছে ছিল। সেই সুযোগটাই প্রথম আমাকে অভিনয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

“চরিত্রের চেহারা, হাঁটা, বসা—এইসব আমার কাছে প্রাথমিক নয়। আমি প্রথমেই চেষ্টা করি তার মন বোঝার। সে কী ভাবছে, কীভাবে চিন্তা করে, কোন সামাজিক স্তর থেকে এসেছে, তার মানসিক গঠন কেমন—এসব আগে বুঝি। এইটুকুই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে সেই মনটাই আমার শরীরের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে। আমি চরিত্রের শরীরের আগে মনের দিকটা জানার চেষ্টা করি। ধরুন, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র—আমার সঙ্গে তাঁর গড়নের কোনও মিল নেই। তবুও আমাকে পার্ট করতে হবে। তখন যদি আমি চরিত্রের মন বুঝি, তাঁর অবস্থান বুঝি, সেই সময়টাতে তিনি কী ভাবছেন, অর্থাৎ তাঁর মতো ‘ভাবা’র চেষ্টা করি—তবেই আমি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারব। তবে এই বিষয়গুলোর সঙ্গে অনুভব মেলানোটা জরুরি। শুধুই তথ্য জানলেই তো হয় না। সেই মানুষটার জায়গায় নিজেকে বসাতে পারাটাই সবচেয়ে জরুরি। তারপর তো কস্টিউম, লুক, শরীরী ভাষা—এসব নিয়ে কাজ হয়। আমার মনে হয়, একজন অভিনেতা হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে চরিত্রটির মানসিকতা আর হৃদয় বোঝা। শুধু শরীরী ভঙ্গি অনুকরণ করে অভিনয় করা সম্ভব নয়।”

তবে এটা আমার সৌভাগ্য যে বাড়ির পক্ষ থেকে অভিনয় করার জন্য খুবই ইতিবাচক সাড়া পেয়েছিলাম। বাবা-মা কখনো কোনও বিষয়ে বাধা দেননি। কখনও বলেননি, “না, এখন পরীক্ষার সময়, অভিনয় কোরো না।” তবে তারা শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু আমি যেটা করতে চেয়েছি, তাতে আমাকে সব সময় ছেড়ে দিয়েছেন, সমর্থন করেছেন।

প্র : অভিনয়কে সিরিয়াসলি পেশা হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত কখন নিলেন ?

অনির্বাণ : অনেক দেরিতে। ২০১৭ সালে আমি আমার ১৪ বছরের কলেজের চাকরি ছেড়ে দিলাম। তখনও আমি জানতাম না কাকে ফোন করব, কোথায় যাব—সেই রকম কোনও কানেকশন আমার ছিল না। ভাবলাম, শুধুই থিয়েটার করব। ২০১৮ সাল থেকে ওটাই শুরু করি। তারপর একের পর এক সুযোগ আসে। তবে এত বছর চাকরির পর শিল্পে আসার ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্তটা মোটেই সহজ ছিল না। বারবার ভেবেছি, এগিয়েছি, পিছিয়েছি। কারণ এই ফিল্ডটা অনিশ্চয়তায় ভরা। যেখানে মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট মাইনে পাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল, সেখানে হঠাৎ শিল্পের অনিশ্চিত জগতে ঝাঁপ দেওয়া একেবারেই সহজ ছিল না। তবে শেষে মনে হলো, যদি এটা না করি, তাহলে সারাজীবন হয়তো আফসোস করব—যে আমি তো চেষ্টা করেই দেখিনি কখনও।

প্র : আপনি একটি নতুন চরিত্র পেলে প্রথমেই কোন দিকে মনোযোগ দেন—তার শরীরী ভাষা, মানসিক অবস্থান, না তার আর্থ-সামাজিক কাঠামো ?

অনির্বাণ : চরিত্রের চেহারা, হাঁটা, বসা—এইসব আমার কাছে প্রাথমিক নয়। আমি প্রথমেই চেষ্টা করি তার মন বোঝার। সে কী ভাবছে, কীভাবে চিন্তা করে, কোন সামাজিক স্তর থেকে এসেছে, তার মানসিক গঠন কেমন—এসব আগে বুঝি। এইটুকুই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে সেই মনটাই আমার শরীরের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে। আমি চরিত্রের শরীরের আগে মনের দিকটা জানার চেষ্টা করি। ধরুন, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র—আমার সঙ্গে তাঁর গড়নের কোনও মিল নেই। তবুও আমাকে পার্ট

FUTURE RIGHT
FINANCIAL
CONTACT US
Lipsa Rath
(669)245-8382

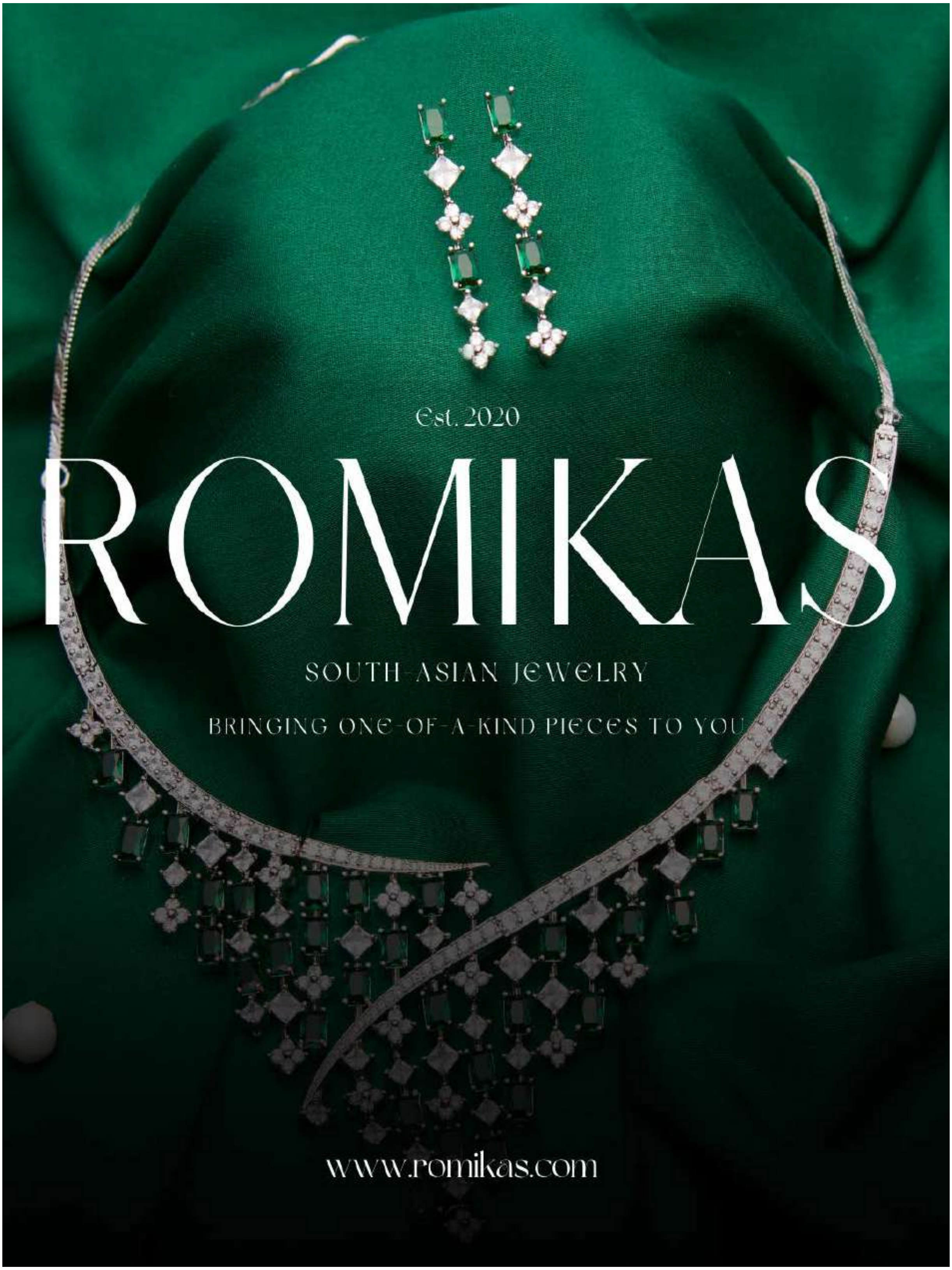
Est. 2020
ROMIKAS
SOUTH-ASIAN JEWELRY
BRINGING ONE-OF-A-KIND PIECES TO YOU
www.romikas.com

করতে হবে। তখন যদি আমি চরিত্রের মন বুঝি, তাঁর অবস্থান বুঝি, সেই সময়টাতে তিনি কী ভাবছেন, অর্থাৎ তাঁর মতো 'ভাবা'র চেষ্টা করি—তবেই আমি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারব। আমি অভিনয়ের প্রস্তুতি হিসাবে এগুলোই করে থাকি। তবে এই বিষয়গুলোর সঙ্গে অনুভব মেলানোটা জরুরি। শুধুই তথ্য জানলেই তো হয় না। সেই মানুষটার জায়গায় নিজেকে বসাতে পারাটাই সবচেয়ে জরুরি। তারপর তো কস্টিউম, লুক, শরীরী ভাষা—এসব নিয়ে কাজ হয়। আমার মনে হয়, একজন অভিনেতা হিসেবে আমার প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে চরিত্রটির মানসিকতা আর হৃদয় বোঝা। চরিত্রটি কে, কী ভাবে, কী চায়, তার আবেগ কোথায়—এসব না বুঝে শুধু শরীরী ভঙ্গি অনুকরণ করে অভিনয় করা সম্ভব নয়। এটা ভিতর থেকে আসতে হয়।

প্র : আপনি চরিত্র নির্মাণের সময় কী নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেন, নাকি মূলত কল্পনার উপর?

অনির্বাণ : আসলে এটা একটা মিশ্রণ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজে লাগে। কিন্তু সব চরিত্র তো আমি জীবনে অনুভব করিনি! যেমন—একটি ছবিতে আমার মেয়ের চরিত্র আছে। বাস্তবে তো আমার কোনও সন্তান নেই। তাহলে আমি সেই অনুভবটা কীভাবে ফুটিয়ে তুলি? আমি তখন যেটা করি, সেটা হলো—আমার নিজের দেখা সম্পর্কগুলো থেকে অনুভব খুঁজে আনি। যেমন, বাবা-মেয়ের যে সম্পর্ক আমি দেখেছি বা আমি নিজে সন্তান হিসেবে কেমন। আমার বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্ক বা আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকটা বুঝে নিতে পারি। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা—এসব কেবল নির্দিষ্ট সম্পর্ক মেপে হয় না। আমি কারও প্রতি সহানুভূতিশীল হতে পারি, স্নেহ রাখতে পারি, সেটা বয়স, সম্পর্ক, সব কিছুকে ছাপিয়ে। সেই অনুভূতিগুলোর মিশ্রণ থেকেই আমি চরিত্রের ভিত গড়ার চেষ্টা করি।

প্র : আপনি তো অভিনয়ের কোনও ফর্মাল প্রশিক্ষণ নেননি, ঠিক?

অনির্বাণ : হ্যাঁ, একদম ঠিক। আমি তো অ-প্রশিক্ষিত একজন অভিনেতা। কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনয় বা থিয়েটার নিয়ে পড়িনি। অভিনয় শিখেছি মঞ্চে কাজ করতে

করতে—doing through learning। পরবর্তী সময়ে নিজের গরজে অনেক পড়াশোনা করেছি, কিন্তু শুরুটা পুরোপুরি প্র্যাকটিক্যাল-ওরিয়েন্টেড ছিল। তাই আমি সব সময় চেষ্টা করি, বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলোকে নিজের মধ্যে ধরে রাখার। তবে এটাও ঠিক বাস্তবে কোনও ঘটনা দেখে বলি না—"এইটা আমি অভিনয়ে কাজে লাগাবো!" এভাবে তো হয় না বিষয়টা। অভিজ্ঞতা ভিতরে জমে থাকে, তারপরে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে সেগুলো বেরিয়ে আসে—হয়তো একটা সুতোয় টান পড়ল আর সেই অভিজ্ঞতা টেনে আনল।

কিন্তু এজন্য খুব জরুরি একটা জিনিস—non-judgemental হওয়া। আমি যদি জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি খুব জাজমেন্টাল হই, তাহলে সেই অভিজ্ঞতাগুলো ভিতরে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। একজন অভিনেতার মনে সহনশীলতা, গ্রহণ করার ক্ষমতা, অনুভবের জায়গা খোলা রাখা খুব দরকার।

প্র : মঞ্চ আর ক্যামেরা—দু'টো মাধ্যমেই আপনি কাজ করেছেন। মঞ্চ অভিনয় থেকে ক্যামেরার সামনে অভিনয় --- দুই ক্ষেত্রে অভিনয়ের মাত্রার তারতম্য আছে। আপনি

এই বিষয়টিকে কীভাবে সামলান ?

অনির্বাণ : এটা স্কিলের ব্যাপার। আর সেটা একদিনে হয় না, করতে করতে আসে। আমি তো মঞ্চে অনেক আগে থেকেই অভিনয় করছি। মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন সংলাপ বলি, তখন আমাকে ভাবতে হয় সামনের রো-তে বসা দর্শক যেন না ভাবে আমি চিৎকার করছি, আবার শেষ রো তে বা পিছনের দর্শক যেন ঠিকভাবে শুনতে পান—এই ব্যালান্সটা তৈরি করতে হয়।

এই স্কিলটা ক্যামেরার সামনে অবশ্য লাগে না। কারণ সিনেমায় আমি যে সংলাপ বলছি, পরে সেটা ডাবিং হয়। সেখানে এতটা প্রজেকশন দরকার পড়ে না, বরং সূক্ষ্মতার গুরুত্ব অনেক বেশি।

আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, দেবশঙ্কর হালদার, গৌতম হালদার, সুদীপা বসুদের মতো বড় মাপের অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। ওঁদের থেকে দেখে অনেক কিছু শিখেছি। আমি সবসময় বলি, শেখার তাগিদ নিজের থাকা উচিত। কেউ সরাসরি শিখিয়ে দেবে না—“এইভাবে অভিনয় করো, ওইভাবে অভিনয় করো”—এমনটা বলে দেয় না। কিন্তু ওঁদের সঙ্গে মঞ্চে কাজ করতে করতে চোখ-কান খোলা রাখলে অনেক কিছু শিখে ফেলা যায়। ওঁদের অভিনয় দেখলে বোঝা যায়, কীভাবে একটা সংলাপে প্রাণ আসে, কীভাবে শরীর নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কীভাবে আবেগ বোঝাতে হয়।

প্র : আপনি কি নিজেকে ‘স্বাভাবিক’ অভিনয়ের ধারার সঙ্গে যুক্ত মনে করেন?

অনির্বাণ : আমি ‘স্বাভাবিক অভিনয়’ কথাটা খুব সচেতনভাবে ব্যবহার করি না। কারণ, অভিনয় মানেই তো একটা নির্মাণ। তবে হ্যাঁ, আমি এমন অভিনয় করতে চাই যেটা দর্শকের কাছে বাস্তব মনে হয়, যেন চরিত্রটা তার চারপাশেই আছে। তবে প্রতিটি নাটকে বা যে কোনও চরিত্রের নিজস্ব ছন্দ থাকে। যেমন আমি ‘মারীচ সংবাদ’-এ যে চরিত্রে অভিনয় করেছি, সেখানে সংলাপ ছন্দে লেখা, তাই তার টোন-প্রজেকশন, উচ্চারণও আলাদা। অন্য নাটকে সেটা একেবারে বদলে যাবে। তাই সব কিছু নির্ভর করে প্রসঙ্গ আর প্রেক্ষাপটের উপর।

আমি বলতে চাইছি, মঞ্চ আর ক্যামেরার সামনে অভিনয়ের মধ্যে একটা বড় সুবিধা হচ্ছে—টেকনোলজি। স্টেজে যেমন আমাকে নিজের গলায় পুরো হল কভার করতে হয়, সিনেমায় সেটা আমার দায়িত্ব না। প্রজেকশন, শব্দ পৌঁছনো—সবটাই প্রযুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত হয়। ফলে আমার কাজটা হয়ে দাঁড়ায় বিশুদ্ধ অনুভব আর স্বচ্ছন্দ প্রকাশ।

স্টেজে আমি জানি কোথায় দাঁড়ালে আলো ভালো আসবে, কোন দিক থেকে সহ-অভিনেতা আসছে, সেটে কোথায় কী রাখা আছে—সব মুখস্থ থাকে। রিহার্সাল তো অনেক হয়। থিয়েটারে একটা সমস্যা হলো—যত বেশি রিহার্সাল করি, অভিনয়টা ততটাই মেকানিকাল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অথচ অভিনয়টা এমন হওয়া উচিত, যেন সেটা এই মুহূর্তেই ঘটছে, প্রথমবারের মতো, দর্শকও যেন সেটাই অনুভব করেন।

তাই আমি প্রথমে রিহার্সাল করে সবটা আয়ত্তে নিয়ে নিই। তারপর চেষ্টা করি নিজেকে খানিকটা 'আনলার্ন' করতে—অর্থাৎ অভিনয়টা যেন টাটকা থাকে, ইম্প্রোভাইজেশনের একটা স্পেস রাখি। সংলাপ, মুভমেন্ট সব ঠিক থাকে, কিন্তু অভিব্যক্তিতে থাকে স্বতঃস্ফূর্ততা। কিন্তু স্ক্রিনে সেই সুযোগ নেই। অনেক সময় শ্যুটিংয়ের

আগেই সবকিছু জানাও থাকে না—যেমন, আজকের দৃশ্য কোন ঘরে হবে, কোথায় বসবে চরিত্রটা, সেই ঘরে চেয়ারে বসা আদৌ সম্ভব কি না—এইসব অনেক কিছু রিয়েল টাইমে বুঝে নিতে হয়। আগে থেকে যদি সব কিছু আমি ভেবে থাকি দৃশ্যটা কোথায় কীভাবে হবে তাহলে আমি নিজেকে বেঁধে ফেললাম। কারণ শ্যুটিংয়ে গিয়ে হঠাৎ পরিস্থিতি বদলালে আমার অভিনয়ের গতি হারিয়ে যাবে।

প্র : আপনি বললেন 'লার্ন অ্যান্ড আনলার্ন'—এই বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবেন ? সিনেমার ক্ষেত্রে কি একই কৌশল আপনি মেনে চলেন ?

অনির্বাণ : অনেকটাই তাই। যেমন ধরুন, আজ আমি শ্যুট করছি আমার লিভিং রুমে, কিন্তু যদি সেটে গিয়ে দেখি সেখানে বসার জায়গাই নেই, অথচ আমি আগে থেকে ঠিক করে ফেলেছি বসে সংলাপটা বলব—তাহলে মুশকিল। তাই সিনেমার ক্ষেত্রে আমি অন্তত প্রস্তুত হই এইটা ভেবে যে, দৃশ্যের কম্পোজিশন যেমন হবে তেমন ভাবেই করব। কিন্তু শ্যুটিং-এর আগে স্থির করে যাই না। আমি নিজের মধ্যে সেই স্পেসটাকে খোলা রাখি।

প্র : মঞ্চে 'তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া' এবং সিনেমায় 'সম্পাদনার পরবর্তী রূপান্তর'—এই দু'টির মধ্যে কোনটা আপনার শিল্পসত্তাকে বেশি আকৃষ্ট করে ? সেক্ষেত্রে স্টেজের মতো সিনেমায় আপনি সেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া তো পান না। এটা কি আপনার কাছে সীমাবদ্ধতা মনে হয়?

অনির্বাণ : অবশ্যই। স্টেজের সবচেয়ে বড় পাওনা হলো লাইভ রিঅ্যাকশন। একজন শিল্পী হিসেবে এটা ভীষণ তৃপ্তিদায়ক—দর্শকের হাসি, কান্না, স্তব্ধতা, মোবাইলের আওয়াজ—সব কিছু আমার অভিনয়ে সরাসরি প্রভাব ফেলে। যেদিন একটাও মোবাইল বাজে না, সেদিনের অভিনয়টাই অন্যরকম হয়। আরেকটা দিন হয়তো বারবার থেমে যেতে হচ্ছে, বিরক্তি হচ্ছে—তবু সেটা নিয়েই পারফর্ম করতে হয়। অর্থাৎ দর্শকও কিন্তু আমার পারফরম্যান্সের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

সিনেমায় আমি হয়তো একটা দৃশ্যে অসাধারণ অভিনয় করলাম, কিন্তু শেষমেশ এডিটে ব্যবহার করা হলো অন্য একটা শট। কারণ সেটা হয়তো টেকনিক্যালি ভালো ছিল, অথবা ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল ভালো ছিল। তখন অভিনেতা হিসাবে মনে হয়—'ইশ, এটা আরও ভালো করা যেত'—ঘরে ফিরেও মনটা খুঁত-খুঁত করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার হাতে আর কিছু নেই, সুযোগও নেই। এটা গায়কদের ক্ষেত্রেও হয়—রেকর্ড হয়ে গিয়েছে, হয়তো মনে হয় কোনও জায়গা যদি আর একটু অন্যরকম করে গাইতাম ! স্টেজে অবশ্য পরের দিনের অভিনয়টা আলাদা করার চেষ্টা করা যায়। ভালো হবে কি না সেটা অন্য প্রশ্ন, কিন্তু একটা সুযোগ থাকে।

প্র : তাহলে আপনি ব্যক্তিগতভাবে কোন মাধ্যমে বেশি শিল্পসন্তুষ্টি পান?

অনির্বাণ : সত্যি বলতে, লাইভ পারফর্ম্যান্স সবসময়েই অন্যরকম আনন্দ দেয়। সেই ইন্টার্যাকশন, সেই মুহূর্তের উত্তেজনা, ভুল হলে সামলে নেওয়ার দক্ষতা, দর্শকের সঙ্গে শেয়ার করার অনুভূতি—সবমিলিয়ে মঞ্চ একটা বেঁচে থাকার জায়গা। তবে সিনেমাও আমাকে শিখিয়েছে অন্য এক রকম সংযম, সূক্ষ্মতা আর দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে আমি দুটো মাধ্যমকেই ভালোবাসি, কিন্তু মঞ্চের আকর্ষণ একটু আলাদা।

প্র : আপনি কি কখনও একই চরিত্র বারবার নিজের মধ্যে পুনর্নির্মাণ করেছেন, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে? যেমন, একের পর এক একেন বাবু চরিত্রটি নিয়ে সিরিজে অভিনয় করার সময়।

অনির্বাণ : খুব জরুরি প্রশ্ন। না হলে সত্যি বলতে কী, অনেক আগেই বোরিং হয়ে যেত। একটা চরিত্র যখন আপনি বারবার করছেন, তখন গল্পের দিকটা তো পরিচালক বা চিত্রনাট্যকার সামলাচ্ছেন, কিন্তু চরিত্রটাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার দায়টা তো মূলত অভিনেতার। আমার কাছে এটা এক অন্যরকম চ্যালেঞ্জ। প্রথমত, একেন বাবুর কিছু কমন বৈশিষ্ট্য তো থাকতেই হবে, যাতে পরের পর্বে গিয়েও মানুষ বুঝতে পারে, হ্যাঁ—এই লোকটাই একেনবাবু। সেই কন্টিনিউটি বজায় রাখতে হয়। কিন্তু সেটার মধ্যেও এমন কিছু ঢোকাতে হয় যাতে মনে না হয়, আমি আগেরটাই শুধু রিপ্লে করছি।

প্র : তাহলে নতুনত্বটা আপনি ঠিক কোথায় আনেন ?

অনির্বাণ : নতুনত্বটা চরিত্রটার মধ্যেই খুঁজি। প্রথমবার যখন একেনবাবু করেছিলাম, ২০১৮-তে, তখন আমি চরিত্রটাকে একভাবে চিনতাম। কিন্তু এখন আমি তাকে অন্যভাবে

চিনি। তখন একরকম 'সোজাসাপ্টা' লোক মনে হত। এখন বুঝি, একেন বাবুকে যতটা সরল মনে হয়, আসলে ততটা সরল কিন্তু নন। সরলতা তার একটা 'অস্ত্র'। তিনি জানেন কোথায় ছেলেমানুষি দেখাতে হবে, আর কোথায় নিজের বুদ্ধিকে সামনে আনতে হবে। মানে চরিত্রটা নিজেই একটা যেন অভিনয় করে চলে। যেমন ধরুন, অনেক কিছু বুঝেও তিনি না-বোঝার ভান করেন। বন্ধুরাও ওকে বোঝেন না পুরোপুরি। ওদের কাছে সবকিছু ধোঁয়াশা করে রাখেন। অনেক কিছু হেসে উড়িয়ে দেন, অথচ ভিতরে ভিতরে পুরো ছক কষে ফেলেন। এই দ্বৈততা চরিত্রটাকে রসালো করে তোলে।

আমি নিজেই একেন বাবুকে হয়তো পুরোপুরি চিনে উঠতে পারিনি। সবসময় মাথায় রাখি—মানুষ যেমন সারাজীবন একজন মানুষকে চিনেও পুরোটা বুঝতে পারে না, তেমনি আমি একেনবাবুকেও পুরোটা চিনেও চিনতে পারি না।

আমার মনে হয়, কখনও কি আমরা একেন বাবুকে রেগে যেতে দেখেছি? না। তাহলে কি তার মধ্যে রাগ নেই? অথবা মন খারাপ? আমরা তো সবসময় দেখেছি, তিনি হিউমার দিয়ে সব ঢেকে দেন। কিন্তু ওঁর ভিতরে কি সত্যিই রাগ বা কোনও রিয়াকশন হয় না-এই প্রশ্নগুলোকে আমি character-এর future possibility হিসেবেই রেখে দিই।

আসলে প্রতিবার একই চরিত্রকে আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা খুবই তৃপ্তিকর। এটা ঠিক যেন এক মানুষকে প্রতি বার একটু একটু করে নতুন করে চিনে নেওয়া। আজও আমি বলব, একেন বাবু চরিত্রটা জীবন্ত আছে কারণ ওর মধ্যে এখনও অনেক অলিগলি আছে, যেগুলো আমার এখনও দেখা হয়নি। সেই অজানা জায়গাটাকেই আমি রেখে দিই, কারণ সেটাই তো আমার আগ্রহকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং দর্শকের কাছেও চরিত্রটাকে নতুন করে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। তাই একেন বাবু এখনও ক্লান্তিকর নয়, বরং রহস্যময়। সে নিজেই একটা ধাঁধা! আর আমি, একজন অভিনেতা হিসেবে, সেই ধাঁধার উত্তর খুঁজেই যাচ্ছি...

প্র : একেন বাবু চরিত্রের ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে মন ও শরীরকে প্রস্তুত করে দারুণ ভাবে অভিনয়ের ভাষায় রূপান্তরিত করেন?

অনির্বাণ : একেন বাবুতে রাজস্থানে একটা সিকোয়েন্স ছিল। তাতে উট চড়ার একটা দৃশ্য আছে। তখন আমার মনে হল, এই দৃশ্যটা দর্শকদেরকে 'সোনার কেল্লা'-র সেই আইকনিক দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে—যেখানে ফেলুদা, তোপসে, আর জটায়ু উটে উঠছেন। একথা ঠিক যে, কেউ কেউ একেন বাবু আর জটায়ুর মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পান। জটায়ুর একটা ছায়া পড়ছে এই চরিত্রটার উপর। আমি জানি, এই ধরনের মুহূর্তগুলো দর্শককে স্মরণ করিয়ে দেয় জটায়ুর বিখ্যাত রিঅ্যাকশনগুলো। তখন আমার জন্য প্রশ্ন ছিল—আমি কীভাবে রিঅ্যাক্ট করব একেন বাবু হিসেবে ? তখন যদি আমি অতিরিক্ত নাটকীয় করে ফেলি, তাহলে মুশকিল। আবার কেউ ভাবতেই পারেন, আমি নকল করছি জটায়ুকে বা ইচ্ছাকৃতভাবে রেফারেন্স টানছি। সেটা আমি একদম চাইনি। আমি তখন ভাবলাম, একেন বাবু একজন ট্রেন্ড পুলিশ অফিসার। তিনি পেশাদার, খুব স্মার্ট। তার মধ্যে ছেলেমানুষি বা হাস্যরস থাকে ঠিকই, কিন্তু যখন তিনি কাজে থাকেন, তখন তিনি সিরিয়াস। উটের পিঠে চড়াটা যদি এক অংশের জন্য হাসির বা অস্বস্তির কারণও হয়, তাও আমি ঠিক করেছিলাম—একেন বাবু সোজাসাপ্টা উঠে যাবেন, কোনও ভয় বা

সংকোচ ছাড়া। কারণ যেই মুহূর্তে তিনি কাউকে ধাওয়া করছেন, কাউকে তাড়া করছেন, তখন তিনি হাসির পাত্র নন, বরং একজন দক্ষ গোয়েন্দা। সে উট হোক বা হেলিকপ্টার, অভিনেতা হিসেবে সিদ্ধান্ত নিতে হয়—একেন বাবু যে কোনও অচেনা জায়গায় কেমন ব্যবহার করবেন! তিনি ভয় পাবেন, নাকি অভ্যস্তভাবে সামলাবেন!

প্র: আপনার অভিনয়ে ফিজিক্যাল এক্সপ্রেশন ও মুখের অভিব্যক্তির একটা জোরালো প্রভাব থাকে। আপনি কীভাবে এই ব্যালান্সটা তৈরি করেন ? বিশেষ করে, একেন বাবুর মতো রিঅ্যাকশন-প্রবণ চরিত্রে ?

অনির্বাণ : এটা সত্যি, একেনবাবু খুব রিঅ্যাকটিভ একজন মানুষ। কিন্তু আমি আলাদা করে শরীরী ভাষা বা এক্সপ্রেশন নিয়ে কখনও ভাবি না। আমি যখন কোনও চরিত্রে অভিনয় করি—থিয়েটার হোক বা সিনেমা—প্রথমেই আমি খুঁজে বের করতে চাই এই মানুষটা কে? সে কীভাবে চিন্তা করে, তার মানসিক গঠন কেমন, কিসে সে খুশি হয় বা রেগে যায়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে খুঁজতেই তার শরীরী ভাষা, তার বসার ধরন, হাঁটার গতি বা কথা বলার ভঙ্গি—এসব আপনাতেই গড়ে ওঠে। আলাদা করে 'ও কেমন হাঁটবে'—এই নিয়ে আমি খুব সচেতন হই না।

তবে অবশ্যই, যদি কোনও চরিত্রের আগে থেকে কিছু 'পিকিউলিয়ার' ব্যাপার লেখা থাকে, যেমন কিছু অভ্যাস বা হাবভাব—তাহলে তো সেটাকে ধরতেই হয়। আমি মূলত চেষ্টা করি চরিত্রটাকে সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যেতে। শরীর ও মুখ তো আসলে মনের এক্সটেনশন। তাই মনটা ঠিকঠাক বুঝলেই বাকিটা এসে যায়।

প্র : আপনার কোনও স্বপ্নের চরিত্র আছে, যেটা আপনি অভিনয় করতে চান ?

অনির্বাণ : না, বিশেষ কোনও 'স্বপ্নের চরিত্র' আমার নেই। তবে হ্যাঁ, জটিল চরিত্র আমাকে খুব টানে। বাস্তবে যেমন মানুষ একমাত্রিক (monolithic) হয় না, সবারই অনেক স্তর থাকে—তেমনি চরিত্রও যদি স্তরবিশিষ্ট হয়, layered হয়, আমি তাতেই আগ্রহ পাই। ডার্ক ক্যারেক্টার, গ্রে শেডের চরিত্র—এইসব আমাকে বেশি টানে। কারণ সেখানে অনেক কিছু অনুসন্ধানের একটা জায়গা থাকে। যেমন আমি 'প্রধান' ছবিতে যে চরিত্র করেছি, সেটাকে লোকে ভিলেন বলবে, কিন্তু আমি সেখানে পজিটিভ কিছু দেখতে পেয়েছিলাম। আমি যেসব তথাকথিত ভিলেন বা নেতিবাচক চরিত্র করেছি, সেগুলোতে অভিনয় করতে আমার খুব ভালো লেগেছে।

আমি বিশ্বাস করি—এমন কোনও মানুষ নেই, যে সকালে উঠে ভাবে, 'চলো আজ একটা খারাপ কাজ করি।' আমরা যাদের 'ভিলেন' বলি, তাদের চোখে কিন্তু তারা নিজেই ঠিক। তারা হয়তো বিশ্বাস করে যে তারা যা করছে, সেটাই ন্যায্য। সেটা হয়তো সমাজের চোখে ভুল, কিন্তু তাদের চোখে তো নয়। সেক্ষেত্রে আমি সবসময় খুঁজে বের করার চেষ্টা করি—এই মানুষটা কেন এমন করছে? তার নিজের মধ্যে কি যুক্তি আছে? কীভাবে সে নিজের আচরণকে বৈধ মনে করছে?

প্র : মনে হচ্ছে আপনি চরিত্রের ভিতরে ঢুকে তার 'লজিক্যাল মেকানিজম' বোঝেন।

অনির্বাণ : একদম তাই। আমার অভিনয় মূলত তার উপরই দাঁড়িয়ে—মানুষটা কীভাবে চিন্তা করে --- আমি যদি সেটার খোঁজ না পাই, তাহলে আমি সেই চরিত্রকে বিশ্বাস করতে পারি না। আর আমি যদি বিশ্বাস না করি, দর্শক কেন করবে !

প্র : একেনবাবু চরিত্রটা নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আপনি তো অনেক ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করছেন, কিন্তু প্রফেশনালি এই চরিত্রটা হঠাৎ করে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠবে সেটা কি আগে থেকে আন্দাজ করতে পেরেছিলেন?

অনির্বাণ : একেবারেই না। আমি কোনোদিন কল্পনাও করিনি যে 'একেনবাবু' এতটা জনপ্রিয় হবে, আর দর্শকরা এতটা ভালোবাসবে। এটা আমার জন্য খুবই আনন্দের ও কৃতজ্ঞতার একটা ব্যাপার। আমরা একটা চরিত্র সৃষ্টি করি, কিন্তু সেটা দর্শকদের হৃদয়ে কীভাবে পৌঁছবে, সেটা তো আগে থেকে বলা যায় না। সেটা যখন হয়, তখন খুব ভালো লাগে। আমাদের টিমের কেউই এটা আগে থেকে আন্দাজ করতে পারেনি। এই সাফল্যটা শুধু আমার একার না, পুরো ফ্র্যাঞ্চাইজিটার। আমরা এই ধরনের গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত না।

হ্যাঁ, আমাদের বাঙালিদের তো গোয়েন্দার অভাব নেই—ফেলুদা, ব্যোমকেশ, কিরীটি... প্রত্যেকেরই আলাদা

আলাদা স্টাইল আছে। কিন্তু সেগুলোকে যদি একটা নির্দিষ্ট ব্র্যাকেটে রাখা যায়, তাহলে একেন বাবু একদমই অন্যরকম। তার অ্যাপ্রোচ, তার উপস্থিতি, তার কৌতুক—সব কিছুই আলাদা।

আমরা এরকম একটা 'বাঙালি' গোয়েন্দা চরিত্র আগে দেখিনি, যেটা simultaneously quirky এবং relatable। এই সাফল্যটা এটা টিম effort ছিল। আর সাফল্য তো একজনের জন্য আসে না, অনেক ফ্যাক্টর কাজ করে। কিন্তু একেন বাবু চরিত্রটার মধ্যেই এমন কিছু ছিল, যেটা দর্শক খুব সহজে গ্রহণ করেছে।

২০১৮-তে যখন কাজ শুরু হয় তখন অনেকে সন্দিহান ছিল যে এটা আদৌ দর্শকের পছন্দ হবে কিনা। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গেল দর্শক দারুণভাবে গ্রহণ করেছে। এখন যদি বলি, আমার অভিনীত চরিত্রগুলোর মধ্যে একেন বাবু সবচেয়ে পপুলার, তাহলে ভুল বলব না। এটা একজন অভিনেতার কাছে বিশাল ব্যাপার যে রাস্তায় কেউ চিনে ফেলছে। একজন অভিনেতার একটা গোপন ইচ্ছা থাকেই—'লোকে চিনবে', 'লোকে বলবে ওই যে...'। এই জায়গাটায় একেন বাবু আমাকে পৌঁছে দিয়েছে।

প্রাইমারিলি, একেন বাবু সিরিজের পরিচালনা করেছেন জয়দীপ মুখার্জি। এছাড়াও অনির্বাণ মল্লিক, অনুপম হরি, অভিজিৎ চৌধুরীর মতো পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছি। তারা প্রত্যেকেই আমাকে ভরসা করেছেন। একেন বাবুর আগে আমি থিয়েটারে ছিলাম, পড়াতামও। কিন্তু এই চরিত্রটার মাধ্যমে মিডিয়াতে আমার একটা পরিচিতি তৈরি করেছে।

প্র : আবার একটু জটায়ু প্রসঙ্গে আসি। জটায়ু চরিত্রে অভিনয় করার সময়, আপনি কীভাবে ক্যারেক্টার ম্যাপিং করেছিলেন ? পূর্ববর্তী অভিনেতাদের ভার কখনও আপনার মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল?

অনির্বাণ : অবশ্যই সন্তোষ দত্ত একটা benchmark। উনি যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন জটায়ু চরিত্রকে, সেটা ছুঁতে পারা বা ছাড়িয়ে যাওয়া কখনও কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

একদম শুরুতেই বলি, আমি কখনও ভাবিনি যে আমি কোনও আইকনিক চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পাব।

একেন বাবু করতে গিয়ে অনেকেই বলেছিলেন যে আমার লুক, কস্টিউম—সব কিছুতেই একটা জটায়ু-র ছাপ আছে। মিডিয়াতেও তখন লিখতে শুরু করল — "আমরা বোধহয় নতুন জটায়ু পেতে চলেছি।" আমি এগুলো খুব একটা সিরিয়াসলি নিইনি। আল্টিমেটলি, সৃজিত মুখার্জি যখন আমাকে বললেন — "আমি জটায়ু হিসেবে তোমাকে ভাবছি," তখন অবশ্যই আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু আমি প্রথমেই বুঝে গিয়েছিলাম — যদি আমি সন্তোষ দত্তকে নকল করার চেষ্টা করি, তাহলে কাজটা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে যাবে। ওঁর মতো 'towering presence' বাংলা সিনেমায় খুব কমই দেখা গিয়েছে। আমি নিজে এখনও মনে করি, জটায়ু মানেই সন্তোষ দত্ত। এটা অস্বীকার করি না। বরং নিজেকে বলি—আমার সৌভাগ্য যে, আমি এমন একটা চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি। আমার কাছে চ্যালেঞ্জ ছিল—যেন সেটা সন্তোষ দত্তের ব্যর্থ অনুকরণ না হয়। সেটা হলে তা দর্শকের জন্যও হতাশার, আমার জন্যও। সৃজিত আমাদের শুরু থেকেই বলেছিলেন — কাউকে নকল করবে না। নিজেরা চরিত্রটা বুঝে, নিজের মতো করে তৈরি করো। এটা আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল — আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। সেই কারণেই আমরা কিছুটা নতুন ইন্টারপ্রিটেশন করতে পেরেছি, দ্বন্দ্বও হয়েছে, আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু এই স্বাধীনতা আমাদের আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে।

জটায়ুকে আমি সবসময় একজন সোজা-সরল, রসিক, প্রাণবন্ত বাঙালি হিসেবে দেখেছি। একেবারে হৃদয় থেকে ভালো মানুষ। আমি সেই দিকটা ধরে অভিনয় করার চেষ্টা করেছি। কেউ কেউ পছন্দ করেছেন, কেউ করেননি। তুলনা হবে, সেটা জানতাম। কিন্তু সেটা নিয়ে খুব একটা বিচলিত হইনি।

এই প্রসঙ্গে আমার থিয়েটারের অভিজ্ঞতা মনে পড়ে। আমি তো কোথাও কোনো ফর্মাল ট্রেনিং নিইনি, থিয়েটার করতে করতেই শেখা। সেই জার্নিতে আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষক ছিলেন অরুণ মুখোপাধ্যায় — 'চেতনা'-র পরিচালক। উনি বলতেন — "অভিনয় করতে গিয়ে কাউকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা কোরো না। সেটা পরিচালক হোক বা দর্শক—কাউকেই না।" এটা আমার জীবনের একটা মূলমন্ত্র হয়ে গিয়েছে। আমি বরাবর চেষ্টা করি বুঝে অভিনয় করার, কাউকে 'তাক লাগানো'র জন্য না। দ্বন্দ্ব আসতেই পারে, তখন আমি পরিচালকের সঙ্গে বা সহ-অভিনেতার সঙ্গে আলোচনা করি, কিন্তু উদ্দেশ্য একটাই থাকে — সত্যের কাছে পৌঁছানো।

প্র : সাহিত্য-নির্ভর চরিত্রে অভিনয় করা বেশি চ্যালেঞ্জ বলে আপনার মনে হয়? নাকি বিষয়টা তুলনামূলক সোজা, কারণ লেখক আগে থেকেই চরিত্রের সূক্ষ্ম ডিটেলের বুনন করে রেখেছেন।

অনির্বাণ : এটা নির্ভর করে। একেন বাবুর ক্ষেত্রে বলি—যখন প্রথম সিজন করছিলাম, তখন আমি আসলে সুজনবাবুর (সুজন দাশগুপ্ত) লেখা গল্প পড়িনি। প্রথমে শুধু চিত্রনাট্য পড়েছিলাম। আমাকে তখনই বলা হয়েছিল—গল্পের একেন বাবু আর স্ক্রিপ্টের একেন বাবু একটু আলাদা। তাই আমিও ঠিক করলাম, আগে গল্প না পড়াই ভালো। না হলে মাথায় দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। আমার লক্ষ্য ছিল, চিত্রনাট্যের ভিত্তিতে চরিত্রটাকে বোঝা। ওখানে যেভাবে চরিত্রটা উপস্থাপিত হয়েছে, সেটা ধরেই আমি আমার অভিনয় তৈরি করেছি। নিশ্চয়ই উপন্যাস বা গল্প পড়লে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি হয়, সেটা সাহায্যও করে। কিন্তু মূল নির্ভরতা রাখতে হয় চিত্রনাট্যের উপর, কারণ আমাকে তো স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী অভিনয় করতে হবে। তাই আমি চেষ্টা করি স্ক্রিপ্ট থেকেই চরিত্রটাকে গভীরভাবে ধরার। আমার উল্লাস মল্লিকের কাহিনি থেকে 'ডুগডুগি'-র চরিত্রটাকে দারুণ ইন্টারেস্টিং লেগেছিল। আমার পড়তেও খুব ভালো লেগেছিল। ওই চরিত্রটার মধ্যে এত লেয়ার আছে যে কী বলব!

প্র : সংলাপহীন মুহূর্তে আপনি কীভাবে অভিব্যক্তিকে দাঁড় করান? কারণ অভিনয়ের ক্ষেত্রে internal timing বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

অনির্বাণ : এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তবে এটা একটা জিনিস–ধরো, তিনজন অভিনেতা আছেন একটা দৃশ্যে। তাঁদের তিনজনের ঠিকঠাক টিউনিং আছে, সেক্ষেত্রে ইন্টারন্যাল টাইমিংটা সুন্দরভাবে করার অবকাশ থাকে। আবার যখন অন্য একজন অভিনয়টা অন্যরকম করল, সেক্ষেত্রে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি না অভিনয় করি তাহলে পুরো দৃশ্যটাই খারাপ হয়ে যাবে।

প্র : আপনি কি মনে করেন, হাস্যরসের ভিতরে গভীর

বেদনা অথবা জীবন বোধ না থাকলে সত্যিকারের কমেডি সম্ভব নয়? সেই বিষয়টিকে পর্দায় কীভাবে ফুটিয়ে তোলেন?

অনির্বাণ : একেবারেই তাই। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিকারের কমেডির ভিতরে একটা ট্র্যাজিক উপাদান থাকে। চার্লি চ্যাপলিন থেকে শুরু করে যাঁরা বিশ্বমানের কমেডিয়ান, তাঁদের সবার কাজেই একটা দারুণ জীবনবোধ থাকে। হাস্যরস যেন একটা ঢাকনা—যার নীচে অনেক না বলা কথা থাকে।

প্র : কমেডিকে অনেক সময় 'সহজ' বা 'হালকা' ধরনের অভিনয় বলে মনে করা হয়, আপনার অভিমত?

অনির্বাণ : এইটাই সবচেয়ে বড় ভুল। কমেডি হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন অভিনয়। একটু এদিক-ওদিক হলে সেটা স্টিরিওটাইপ, বডি শেমিং, বা খুব মোটা দাগের হয়ে যায়। টাইমিং, ছন্দ, গতি — সবকিছু নিখুঁত না হলে কমেডি ঠিকঠাক দাঁড়ায় না।

আমাদের দেশে এখনও সিরিয়াস অভিনয়কে বেশি মর্যাদা দেওয়া হয় না, আর কমেডিকে একটা নীচু স্তরের ব্যাপার হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু বিদেশে একজন কমেডিয়ানকে সবচেয়ে দক্ষ অভিনেতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

কমেডি আসে 'ল্যাপস অফ লজিক' থেকে। যেখানে যেটা হওয়ার কথা না, সেটা হঠাৎ ঘটে যায় — সেই মোমেন্ট থেকেই কমেডি তৈরি হয়। এটা বুঝে করতে পারাটাই কঠিন ব্যাপার।

প্র : সংলাপ বলার সময় আপনি কীভাবে শব্দের গতি, উচ্চারণ, থেমে যাওয়াকে (pause) পরিকল্পনা করেন ?

অনির্বাণ : না, আমি খুব একটা মার্ক করে রাখি না। বরং আমি চেষ্টা করি, সংলাপের 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ'টা নিজে অনুভব করতে। আমি যেটা বলি— এক ধরনের 'হাফ-বেকড' প্রস্তুতি নিয়ে থাকি। মানে পুরোপুরি তৈরি না, আবার একেবারে প্রস্তুতিহীনও না। মাঝামাঝি জায়গাটা আমার বেশি কাজ করে। কারণ বেশি প্রস্তুত থাকলে সেটা অনেক সময় মেকানিক্যাল হয়ে যায় বলে আমার মনে হয়।

প্র : আপনি কি কখনো ক্যামেরার সামনে ইম্প্রোভাইজ করেছেন ? পরিচালকের থেকে সেই স্বাধীনতা কীভাবে আদায় করে নিতে হয় বলে আপনার মনে হয়?

অনির্বাণ : আমি সাধারণত স্ক্রিপ্টের সংলাপে খুব বেশি পরিবর্তন করি না। যদি মনে হয় কোনও সংলাপ চরিত্রের সঙ্গে যাচ্ছে না, তাহলে আগে থেকেই পরিচালকের সঙ্গে আলোচনা করি। ইম্প্রোভাইজেশনের জায়গা অবশ্যই আছে, কিন্তু সেটা এমনভাবে করা উচিত যাতে সহ-অভিনেতারা বা দৃশ্যের গতি বিঘ্নিত না হয়। কারণ, একটা গ্রুপ পারফর্ম্যান্সে হঠাৎ কিছু যোগ করলে বাকিরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। আমি মনে করি, ইম্প্রোভাইজ করা অবশ্যই করা যায়, কিন্তু তার একটা মাপ থাকা দরকার। কতটুকু করলে সেটা পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে খাপে খায়, সেটা বুঝতে হয়। এটা একটা ব্যালান্স। চরিত্রের সঙ্গে সংযোগ রাখাও জরুরি, আবার পুরোপুরি নিজে থেকে কিছু যোগ করলেও সেটা যেন টোন বা ন্যারেটিভ থেকে বিচ্যুত না হয়।

প্র : রিহার্সাল কেমন গুরুত্বপূর্ণ আপনার জন্য ? আপনি কি প্রতিবার চরিত্রের গভীরে যাওয়ার জন্য রিহার্সাল বা মনিটরে নিজেকে নতুন ভাবে তৈরি করতেন? তবে চলচ্চিত্রে এই সুযোগটা তো কম, সেক্ষেত্রে আপনি কী করেন?

অনির্বাণ : হ্যাঁ, আমি যখন রিহার্সাল বা মনিটর করি, তখন চরিত্রটা নিয়ে আমি যা ভাবছি, সেটাই সরাসরি বলার চেষ্টা করি। সংলাপের যেটুকু সূক্ষ্মতা আছে—মানে কোথায় থামবো, কোথায় জোর দেবো বা কেমনভাবে বলবো—এই জিনিসগুলো আমি খুব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করি।

প্র : আপনি কি আলাদা করে কোনও মেডিটেশন বা কনসেন্ট্রেশন বাড়ানোর প্রস্তুতি নেন? এখনকার সময়টা খুবই অস্থির—বিশেষ করে যারা নতুন অভিনয় শুরু করছেনা, তাঁদের মধ্যে অনেকেই একাগ্রতা ধরে রাখতে পারছেন না। এই দুনিয়ায় নিজের মনঃসংযোগ ঠিক রাখার জন্য আপনি নিজে কী করেন? বা কী পরামর্শ দেবেন?

অনির্বাণ : আসলে আমি ঠিক পরামর্শ দেওয়ার মতো কেউ নই। আমি নিজেকে কোনও গুরু বা খুব বিজ্ঞ মানুষ ভাবতে চাই না। আমি শুধু আমার অভিজ্ঞতা থেকে যা করি, সেটাই বলতে পারি।

আমার জন্য শুধু অভিনয়টাই মুখ্য নয়—জীবনকে আমি কীভাবে দেখি, মানুষকে কীভাবে দেখি, সেটাও সমান

গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি অভিনয়টা করছি খ্যাতির জন্য, নাকি ভালোবাসা থেকে—এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি নিজেকেই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি।

অনেকেই খুব দ্রুত খ্যাতি পেতে চায়, অভিনয়কে একটা মেটেরিয়াল গোল পূরণের হাতিয়ার হিসেবে দেখে। সেটা আমি বলছি না যে ভুল —শুধু বলছি, আগে নিজেকে বোঝা দরকার।

আমি নিজে খুবই সাধারণভাবে জীবন যাপন করি। আমি নিজের মধ্যে থাকতে পছন্দ করি, অনেক কিছুতে নিজেকে জড়াই না। আমি মনে করি, একজন অভিনেতার শুধু অভিনয় জানলেই হবে না, তার একটা ব্রড আউটলুক থাকা দরকার—সমাজ, মানুষ, প্রকৃতি, ইতিহাস, দর্শন, মনস্তত্ত্ব—সবকিছু নিয়ে আগ্রহ থাকা উচিত। পড়াশোনার অভ্যাস থাকা উচিত, শুধু অভিনয়ের বই না, আরও অনেক কিছু।

আমার মতে, আমাদের চারপাশে যা ঘটছে, তার সবকিছু থেকেই শেখা যায়। কিন্তু শেখার জন্য নিজের মনটা খোলা রাখতে হয়। আমি মেডিটেশন করি না ঠিকই, কিন্তু আমি খুব সরলভাবে বাঁচি—আমি চেষ্টা করি কারও অপকার না করতে, নিজের মনকে শান্ত রাখতে। এই সরলতাই আমার একাগ্রতার জায়গা তৈরি করে দেয়। আলাদা করে কনসেন্ট্রেশনের জন্য কিছু করতে হয় না।

আমি কাজের ব্যাপারে খুব সৎ থাকার চেষ্টা করি —একজন অভিনেতা হিসেবে এবং একজন মানুষ হিসেবে। অনেক কিছুর সঙ্গে আপস না করায় আমার পথটা হয়তো একটু কঠিন হয়, তবুও আমি মানসিক শান্তিকে প্রাধান্য দিই।

প্র : বিগত দিনের কোনও ঘটনা বা সাম্প্রতিককালের কোনও অভিজ্ঞতা কি কখনও আপনার অভিনয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে? কিংবা আপনি নতুন ভাবে ভেবেছেন আপনার অভিনয় স্টাইল নিয়ে ?

অনির্বাণ : আমি আলাদা করে নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করিনি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, প্রতিদিনই আমি একটু একটু করে বদলাই। চারপাশে যেটা ঘটছে, সেগুলোর প্রভাব নিশ্চয়ই পড়ছে আমার মধ্যে—সেটা হয়তো আমি কারও সঙ্গে শেয়ার করি না, কিন্তু আমার ভিতরে জমে থাকে। আমি খুব বেশি ভোকাল নই, কাউকে উপদেশ দেওয়ার মতো অবস্থায় নিজেকে ভাবি না। আমি কখনোই বলি না, 'এইটা ভুল, এইটা করো না,' বা 'আমি যা বলছি সেটাই ঠিক।' আমার বিশ্বাস, ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা খুব দরকার।

আমার এই চেষ্টাটা সবসময় থাকে যে আমি যেন আজকের দিনে কালকের চেয়ে একটু ভালো মানুষ হয়ে উঠতে পারি। এটা আমি ভীষণ সচেতনভাবে করি, যাতে আমার মানুষ অনির্বাণ চক্রবর্তী না দুর্বল হয়, যেন আমার কোনও চারিত্রিক বিচ্যুতি না ঘটে। কারণ আমি বিশ্বাস করি, একজন অভিনেতার ব্যক্তিসত্তা এবং মানবিক সত্তা— এই দু'টি আলাদা হলেও একে অপরকে প্রভাবিত করে। তাই আমি চেষ্টা করি, মানুষ অনির্বাণ যেন ভালো থাকে, সৎ থাকে, সংবেদনশীল থাকে। তাহলেই অভিনেতা অনির্বাণও আপনাতেই ঠিক থাকবে দর্শকের কাছে।

প্র : আপনার অভিনয়শৈলীর মধ্যে এমন কী আছে যা আপনাকে আলাদা করে তোলে বলে আপনি মনে করেন ?

অনির্বাণ : এটা বলা খুব কঠিন। আমি নিজে এসব নিয়ে ভাবি না, আর নিজেকে আলাদা করে তুলতে চাওয়ার প্রবণতাও আমার খুব একটা নেই। আমি শুধু চেষ্টা করি চরিত্রটা ঠিকঠাক ভাবে বুঝে, যথাসম্ভব সততার সঙ্গে সেটা মঞ্চে বা ক্যামেরার সামনে জীবন্ত করে তুলতে। বাকিটা দর্শক বলবেন—আমি নই।

আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে আমি খুব আন্তরিকভাবে অভিনয়টা করি, আর আমার কাজের প্রতি একটা গভীর ভালোবাসা আছে। আমি যেটা নিজেকে নিয়ে বলতে পারি তা হলো, আমি খুব sincere – এই কাজটা আমি মনপ্রাণ ঢেলে করি। আমার মধ্যে একটা প্রবল আগ্রহ আছে শেখার, বোঝার, নতুন কিছু আবিষ্কারের। অন্যদের অভিনয় দেখে শেখার চেষ্টা করি সব সময়।

প্র : আপনি কি নিজেকে Method Actor বলে মানেন, না কি আপনি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি নিজস্ব ঘরানা গড়ে তুলেছেন? স্ট্যানিস্লাভস্কি পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন কখনও? এ বিষয়ে আপনার কী মনে হয়, যদি একটু বিস্তারিত বলেন ---

অনির্বাণ : থিয়েটারে যখন সিরিয়াসলি কাজ শুরু করি, তখন আমার প্রথাগত কোনও নাট্যশিক্ষা ছিল না, আগেই বলেছি। তখন থেকেই আমি বিভিন্ন বই পড়া শুরু করি—

Stanislavski, Meisner, Brecht, সব রকম মতবাদ, তাদের বিপরীত মতবাদ—সব কিছুই পড়েছি। কোনওটা আমার চিন্তার সঙ্গে মেলে, কোনওটা নিয়ে সন্দেহ থেকেছে—সেসব নিয়ে আলোচনা করেছি না। কিন্তু অভিনয়ের সময় আমি এসব মেথড ভেবে ভেবে কাজ করি না। অভিনয় তো এমন নয় যে আজ এই দৃশ্যে Stanislavski মেথড, কাল Meisner মেথড! আমার কাছে এসব একটা অর্গ্যানিক প্রসেস। অনেকটা চারপাশের মানুষের দেখাদেখি, জীবন যাপন, সমাজের প্রতিক্রিয়া—সব কিছু আস্তে আস্তে মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়। তারপর সেটা চরিত্রে রূপ নেয়।

প্র : তাহলে আপনি কি কখনও ইচ্ছে করে আলাদা কিছু করতে চান?
অনির্বাণ : না, একদম না। আমি কখনওই ভাবি না যে আমাকে আলাদা কিছু করতে হবে। আমি আমার মতো করে চরিত্রটা করার চেষ্টা করি—যেটা কখনও ঠিক হয়, কখনও ভুল। কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করি। আমি চেষ্টা করি, অভিনয়টা যাতে সহজাত থাকে, খুব বেশি ক্যালকুলেটিভ না হয়ে যায়। কারণ চেষ্টাটাকে যদি খুব বেশি দেখিয়ে ফেলি, তাহলে সেটা দর্শকের কাছে কৃত্রিম লাগবে।

প্র : আপনার মতে, অভিনয়ে 'উন্মত্ততা' ও 'নিয়ন্ত্রণ'—এই দুইয়ের মধ্যে আদর্শ ভারসাম্য কীভাবে তৈরি হয় ?
অনির্বাণ : আমি এটাও খুব গাণিতিকভাবে ভাবি না, বরং অনেকটাই সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করি।

প্র : আপনার প্রিয় অভিনেতা কে? আপনার অভিনয় জীবনের প্রস্তুতি পর্বে কোন কোন অভিনেতাদের অভিনয় দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন?
অনির্বাণ : এই প্রশ্নটা আমি এড়িয়ে যেতে চাই কারণ এমন অনেকেই আছেন। তবে যাঁর নাম একেবারেই না বললেই নয়, তিনি ইরফান খান। ওঁর অভিনয় আমি অসম্ভব পছন্দ করি। অনেকেই বলেন ওঁর অভিনয় 'আন্ডার অ্যাক্টিং', কিন্তু আমি সেটা বলব না। বরং ওঁর অভিনয় একদম যতটা দরকার, ঠিক ততটাই—না কম, না বেশি। এটাকেই আমি নিখুঁত অভিনয় বলি।

প্র : আপনি কী চান, ভবিষ্যতের প্রজন্ম আপনার অভিনয়ের কোন দিকটা মনে রাখুক?
অনির্বাণ : যদি কিছু রেখে যেতে পারি, তবে আমি চাই তারা আমার sincerity আর passion টা মনে রাখুক। আমি সত্যি বলছি, আমি অভিনয়টাকে খুব ভালোবাসি। সেটা যদি কাউকে স্পর্শ করে, সেটাই আমার কাছে অনেক।

প্র : আপনি নিজের কাজকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন—একজন কৌতুকাভিনেতা, না একজন মানবতাবাদী কবি? যার কাছে অভিনয়টা একটা হাতিয়ার মাত্র।
অনির্বাণ : আমি নিজেকে খুব সোজাসাপ্টা একজন মানুষ হিসেবে দেখি—যে অভিনয় করতে ভালোবাসে। এর বাইরে কিছুই না। আমি মনে করি না যে আমি সেরকম কেউ, বা আমার মধ্যে খুব আলাদা কিছু আছে। আমি একজন মানুষ, যে নিজের পছন্দের কাজটা আন্তরিকভাবে করার চেষ্টা করে যায়। এটাই আমার পরিচয়। আমার কোনও 'বায়ো' নেই বললে চলে।

প্র : আগামীদিনে আপনার পরিকল্পনা সম্বন্ধে যদি আপনার অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন তাহলে ভাল হয়।
অনির্বাণ : হ্যাঁ, এখন প্রায় সাত-আটটা ছবির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সবকটাই রিলিজের অপেক্ষায় আছে। ২০২৫-২৬ এর মধ্যে সেগুলো একে একে আসবে বলে আশা করছি। কিছু ওয়েব সিরিজও ছিল, কিন্তু এখন আপাতত নতুন কোনও ওয়েব প্রজেক্টে যুক্ত নেই। তবে ছবিগুলোর রিলিজ ঠিক কবে হবে, সেটা তো আমাদের হাতে থাকে না। এখন অপেক্ষায় আছি, কবে ছবিগুলো মুক্তি পাবে আর দর্শকেরা দেখতে পাবেন, সেইটার। তাঁদের ভালো লাগলেই, আমার আনন্দ। অভিনেতা হিসাবে তবেই আমি সার্থক।

তৃতীয় ব্যক্তি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সব সময়ই এই তৃতীয় ব্যক্তিটি এসে আমার সব কাজে নাক গলায়। মুশকিল এই লোকটিকে আমি কখনো ধরতে পারিনি হাতে নাতে। আসলে তো যে কোন লোক নয়। অশরীরি প্রেত, দুষ্ট বাতাস, কপিত গ্রহ কিংবা আমারই অন্তর্নিহিত কোন প্রবৃত্তিজাত দুর্বলতা, তাকে দেখা বা ধরা না যাক টের পাওয়া যাবেই।

রাতে শোয়ার ঘরে দেখি, পাখা বন্ধ, গরম লাগছিল বলে, যেই পাখা চালাতে গেছি অমনি স্ত্রী বললেন, পাখা চালিয়ো না, আমার গায়ে কাঁটা কাঁটা দিচ্ছে।

এ প্রায়-দিনের ঘটনা, স্ত্রীর ইসিনোফেলিয়া আছে বলে গ্রীষ্মেও একটা শীত শীতভাব টের পান, দুর্জয় গরমেও মাঝে মাঝে গায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে তাকে শুতে হয়।

কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর আমার অসম্ভব গরম লাগছে। ঘামও হয় প্রচন্ড। তাই বললাম, আচ্ছা, আস্তে চালাই বরং। তুমিও গায়ে একটা ঢাকা দাও। বেশ ভালো কথাবার্তা চলছে স্বামী-স্ত্রীর, আমার মেয়েটি গভীর ঘুমে, ঘরে আর কেউ কোথাও নেই।

কিন্তু সেই অশরীরি তৃতীয় ব্যক্তিটি ঠিক আড়াল থেকে হেসে উঠলো।

তুই ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বলল, তুমি সব সময় ছোটখাট ব্যাপারেও জোর খাটাও কেন বল তো। বলছি পাখা চালালে আমার শীত করে।

আমি বলি পাখা না চালালে যে গরমে আমার ঘুম হবে না! শুধু তোমার নিজের দিকটা দেখলেই তো হবে না!

তুই বললেন, নিজের দিকটা আমি দেখি না তোমরা দেখ?

পাঠক, লক্ষ্য করবেন তুই তুমি না বলে তোমরা বলেছেন, অর্থাৎ এখন আমি নই, আমার গোটা পরিবারটাই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু।

আমি অত্যন্ত অভদ্র গলায় বলি, পাখা আমি চালাবই। তুমি দরকার হলে ওঘরে গিয়ে শুতে পারো।

স্ত্রী অত্যন্ত তিক্তস্বরে বলেন, স্বার্থপর। গোটা গুষ্টিই স্বার্থপরের গুষ্টি। কোনদিন তোমরা কারো সুখ সুবিধে বোঝনি।

আমার স্বাভাবিক মাথা, মেজাজ আত্মনিয়ন্ত্রণ জট পাকিয়ে গেল। হঠাৎ হু-হুঙ্কারে বলে উঠি, মুখ সামলে কথা বলবে। আমার গুষ্টি তুলে কথা বললে জুতিয়ে –

বলা বাহুল্য, এরপর যা ঘটল তা আমার বা আমার স্ত্রীর স্বাভাবিক জীবনের ঘটনা নয়। সম্পূর্ণ তৃতীয় পক্ষ যেন এসে আমাদের দুজনের ঘাড়ে ভর করল। তিন দিন উপোসে কাটলো আমার। বাড়িতে প্রায় অরন্ধন। কথাবার্তা ও সব রকম সম্পর্ক বন্ধ।

টার্মিনাল থেকে বাসে উঠেছি। জানালার ধারে একটা বাছাই সিটে গ্যাঁট হয়ে বসে আধা-প্রাকৃতিক, আধা-নাগরিক দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ যাচ্ছি, হঠাৎ টের পাই, পাশে এক অতিশয় বৃদ্ধ মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে বোতল ভাঙা কাঁচের তলানীর মত মোটা কাচের চশমা। রোগা, অশক্ত চেহারা। মুখখানায় শারীরিক নানা কষ্টের ছাপ পড়েছে! ভীড় তাঁকে একবার এদিকে ঠেলছে, একবার ওদিক। কয়েকবার পড়ো পড়ো হতে গিয়ে সামলে গেলেন। হঠাৎ মনে মনে নীতিবোধের বুদ্বুদ উঠতে লাগল – না বুড়ো মানুষটিকে সীটটা ছেড়ে দিই।

ভাববে না ভাবতেই শরীরটাকে কে যেন ঠেলা দিতে লাগল। উঠে পড়ি আর কি!

অমনি তৃতীয় ব্যক্তির ঘনায়মান অস্তিত্ব টের পাই। সে আমাকে চেপে ধরে বলে – উঠবে কেন? বুড়ো লোকটা তো বাসে ভীড় দেখেই উঠেছে। এ বাসে উঠলে যে দাঁড়িয়ে যেতে হবে এ কি ওর জানা ছিল না?

স্ত্রী ঈষৎ বিরক্ত স্বরে বলল, তুমি সব সময় ছোটখাট ব্যাপারেও জোর খাটাও কেন বল তো। বলছি পাখা চালালে আমার শীত করে। আমি বলি পাখা না চালালে যে গরমে আমার ঘুম হবে না!

আমি বলি, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু ফাঁকা বাসই বা পাবে কোথায়? অফিস টাইমের ভীড়ে সব বাসই তো এ রকম। লোকটার হয়তো যাওয়াটা জরুরী, তাই বাধ্য হয়ে উঠতে হয়েছে।

বুড়ো লোকদের ওরকম বাসে ওঠাই অন্যায়। আর যদি উঠেছেই, তবে কখনো তার আশা করা উচিত নয় যে, একজন কেউ না কেউ তাকে বসবার জায়গা ছেড়ে দেবে।

লোকটা কষ্ট পাচ্ছে হে। আমরাও তো বুড়ো হব।

তুমি বসে থাক তো! তুমি ছাড়া আর কারো তো এত চুলকুনি দেখছি না; একা মহৎ হয়ে কি করবে? আর পাঁচজন যখন ছাড়ছে না, তুমিও ছেড়ো না। কথাটা আমার যুক্তিযুক্তই মনে হয়। আমি তো একাই বসে নেই। আরো অনেকে বসে আছে। তারা ছাড়ছে না আমিই বা কেন তাহলে সীট ছাড়ব! কিন্তু মনে তবু অস্বস্তি হতেই থাকে। বুড়ো মানুষটির দিকে তাকানোই ভুল হয়েছে। এবার থেকে যখন জানালার পাশে বসব তখন কিছুতেই আর বাসের ভেতরের দিকটা লক্ষ্য করব না। আগাগোড়া বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকব ঘাড় শক্ত করে।

ঠিক এ সময়ে আমার পিছনের সীটে একজন প্রৌঢ় বলে উঠলেন, – ও দাদা, আপনি এসে আমার জায়গায় বসুন। এই বলে বুড়ো মানুষটিকে ডেকে তিনি উঠে দাঁড়ান। বুড়ো কয়েকবার একটু মৃদু আপত্তি তুলতে, আশপাশের লোকজন বলে, যান দাদা, বসে পড়ুন। বুড়ো মানুষ কষ্ট পাচ্ছেন দাঁড়িয়ে। বুড়ো বসে। প্রৌঢ়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার বুকটা ভরে ওঠে। বুড়ো আর কিছুক্ষণ ওরকম ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আমার অস্বস্তি বেড়ে যেত।

মনে মনে তৃতীয় লোকটাকে ডেকে বলি, তুমি আমাকে নিজের কাছে মহৎ হতে দিলে না। জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলে আমার একটু কষ্ট হত ঠিকই, কিন্তু নিজের প্রতি আমার কিছু শ্রদ্ধা জন্মাত।

তৃতীয় ব্যক্তি উত্তর দিল না। পালিয়েছে।

শিল্পী সন্তুর গল্প

প্রচেত গুপ্ত

মামার চায়ের দোকানের ভিতর বসে আছে সন্তু।

সন্তু কে? তেমন কেউ নয়। ইংরেজিতে বলে ‘নো বডি’। কখনও কখনও এই সব ‘কেউ নয়’ মানুষের ওপর আমাদের নজর পড়ে যায়। এই সন্তুর গল্প, সন্তুদের গল্প আমরা আগেও শুনেছি। এদের গল্প বারবার শোনা যায়, কিন্তু কেউ মনে রাখে না। যাই হোক, গল্প এবার বলি।

এই 'কেউ নয়’ মানুষটার আজ একটা ঝামেলা হয়েছে। ঝামেলার পরে সে একটা সিদ্ধান্তও নিয়েছে। বোকার মতো সিদ্ধান্ত। মানুষ বোকার মতো সিদ্ধান্ত নেয় দু'টো ক্ষেত্রে। রেগে গেলে এবং না রেগে গেলে। এই লোকের বোকার মতো সিদ্ধান্তের কারণ দ্বিতীয়টি। সিদ্ধান্ত নিজেকে নিয়ে নয়, পাশে রাখা বাক্সটা নিয়ে। সেই কারণেই কাহিনির গোড়াতে বাক্সটায় নজর করতে বলছিলাম। যাক, এসব কথা পরে বলা যাবে, আগে এই লোকের সঙ্গে পরিচয় করাই।

নাম সন্তোষ পাল। লোকে চেনে ‘সন্তু’ নামে। বাবার নাম পাণ্ডব পাল। তিনি মারা গিয়েছেন। লোকে তাঁকে ডাকত ‘পানু পাল’। সহজ, সরল, বোকা–সোকা সন্তুর জন্য ছোটোবেলায় বন্ধুরা ছড়া কাটত। সন্তুকে দেখে বয়স কত মনে হচ্ছে আপনার পঞ্চাশ–বাহান্ন নাকি বেশি?

সন্তুর বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই। দারিদ্রের এই এক গুণ, সে খাওয়া পরা ঠিকমতো দিতে পারে না, কিন্তু অকৃপণ হাতে চেহারায় বয়সের ছাপ দেয়। চিন্তায় চুলে পাক ধরায়, অর্থাভাবের লজ্জায় কুঁজো করে ফেলে, চিকিৎসা ও পুষ্টির অভাবে

অকালেই গাদাখানেক অসুখ বিসুখ ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। সন্তুরও তাই হয়েছে। সে চিরকালই টানাটানির মধ্যে থেকেছে। টাকা পয়সার টানাটানি। সেই টানাটানি কখনও আলগা হয়েছে, কখনও টাইট। তবে বছর তিন অবস্থা শোচনীয়। ক্রমশ আরও শোচনীয় হচ্ছে। এখন কী ভাবে সংসার চলে সন্তু নিজেও ভাল মতো জানে না। অন্যের বাড়ির ধান বেছে, চাল ভেঙে, দোকানে দোকানে মোয়া মুড়কি সাপ্লাই করে বউ শান্তি খানিকটা সামাল দেয়। বাকিটা ধার দেনা। এই লোকের চেহারায় বয়েসের ছাপ আসবে না তো কার আসবে?

সন্তু থাকে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে। টালি ভাঙা, দেওয়াল ফুঁড়ে বটের ঝুরি বেরোনো, খানিকটা ভেঙে পড়া, খানিকটা কুঁজো হওয়া, কার্নিশে শ্যাওলা ধরা যে বাড়িটা রয়েছে, সেটাই ওর। 'বাড়ি' বললেও বসবাসের যোগ্য ঘর মাত্র একটাই। একটা নয়, দেড়খানা। দু'টো মানুষের জন্য যথেষ্ট। পানু আর তার বউ শান্তি একরকম হাত পা ছড়িয়েই থেকেছে। তিন বছর আগে পানুর বাবাও ছিল। রোগশয্যায় শুয়ে থাকলেও জায়গা তো লেগেছে। হাঁটা মানুষের তুলনায় শোয়া মানুষের জায়গা একটু বেশিই লাগে। না-হাঁটা মানুষ যেটুকু জায়গা দখল করে, তা সে ছেড়েও দেয়। যাকে বলে স্থান বদল। সেই জায়গায় আরেকজন চলে আসতে পারে। শুয়ে থাকলে সে উপায় নেই। জায়গাটুকু পাকাপাকি দখলে থাকে। সন্তুর বাবার বেলাতেও ঘটনা তাই ছিল। সেই বাবা মারা গেল তিন বছর হল। পুরো তিন নয়, আড়াই মাস কম তিন বছর। তারপর থেকে বাড়িতে শুধু স্বামী স্ত্রী। আজ সকাল থেকে তাও গেল কমে। একটু আগে আপনাকে ঝামেলার কথা বলছিলাম না, এই সেই ঝামেলা। আজ ভোরে সন্তুর বউ শান্তি বাড়ি ছেড়েছে। লুকিয়ে ছাড়েনি, আয়োজন করে ছেড়েছে। ভোরে উঠে সাবান মেখে স্নান করেছে, লাল রঙের শাড়ি পরেছে, কপালে বড় করে টিপ আর চোখে কাজল দিয়েছে। তারপর হাতে সুটকেস নিয়ে সন্তুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এই যে সাজুগুজুর আটিস, সাজ কেমন হয়েছে?'

ঘুম লাগা চোখে অবাক গলায় সন্তু বলল, 'তুমি! এত সকালে যাচ্ছ কই?'

শান্তি নির্লিপ্তভাবে বলল, 'তার আমি কি জানি, গৌর জানে। সে ফুটবল মাঠের কাছে অপেক্ষা করছে, যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে যাব।'

সন্তু আরও অবাক হয়ে বলল, 'গৌর! সে কে আমি বাইরে গেলে এখানে এসে মাঝেমধ্যে থাকে যে ছেলেটা সেই গৌর তোমার কেমন যেন দূর সম্পর্কের দাদা না ভাই হয়'...

শান্তি ঠোঁটে বেঁকিয়ে বলল, 'আমাকেও গোড়ায় তাই বলেছিল। পরে বলল, বানিয়ে দাদা সেজেছে। থেটার, যাত্রাপালার মতো মিথ্যে। তোমাকে রং মাখিয়ে সাজাতে হয়, ও এমনিই সেজেছে। এই বাড়িতে ঘুরঘুর করলে কারও যাতে সন্দেহ না হয়। মহা বদ।'

সন্তু খানিকটা ভেবাচেকা খেয়ে বলল, 'ওর সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি'

শান্তি একটু ভেবে বলল, 'তা বলতে পারো। বেড়ানোই বটে।'

'ফিরবে কবে?'

শান্তি বলল, 'সে ওই বদটাই জানে। মনে হয় না আর ফিরতে দেবে। বলল, আর কতদিন ভাঙা ঘরে ভাঙা বর নিয়ে পড়ে থাকবে হাড়মাস তো কালি করে ফেললে। তোমার সাজুগুজুর আটিস বর পাউডার মেরে গালের কালি, চোখের কালি ঢাকতে পারে, হাড়মাসের কালি তো আর ঢাকতে পারবে না। ওই লোককে ছেড়ে আমার সঙ্গে পালিয়ে চল। শহরে চলে যাই। আমিও ভেবে দেখলাম, বদ হলেও কথাটা গৌর ভুল বলেনি। এখনও গতর আছে, ওটা চলে গেলে বদটা আর ফিরেও তাকাবে না। যাই, বেরিয়েই পড়ি। পরে একটা কিছু করে নেব। সাবধানে থেকো, ঠান্ডা লাগিও না। একা মানুষ অসুখে পড়লে সামলাতে পারবে না।'

সন্তু চুপ করে রইল। শান্তি এগিয়ে এসে সুটকেস নামিয়ে রেখে সন্তুর মাথায় হাত রাখল। নীচু গলায় বলল, 'তোমায় তো আগেই বলেছিলাম, আমাকে একা ফেলে ফেলে অমন চলে যেও না। বলিনি? এখন দুক্কো করে কী হবে। অসুবিধে কিছু হবে না। তুমি তোমার ওই সাজুগুজুর বাক্স নিয়ে সুখেই থাকবে।'

কথাটা ঠিক। শান্তি একথা বলেছিল। বিয়ের কয়েকমাস পরেই বাবা মারা গেল। কাজকর্মের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করল। পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে সন্তু, কাজ চাই, কাজ চাই। এরকম সময় শান্তি একদিন বলল, 'আমার একা থাকতে ভাল লাগে না।'

'কী করব শান্তি, আমার কাজটাই তো এরকম। না, ঘুরলে কাজ পাব না। অবস্থা তো দেখছ। কাজ কোথায়! ধরাধরি করে পেতে হয়। এখন নিজেরাই সব সাজ সেরে ফেলে। পাউডার মেখে নেয়, কাজল টানে।' শান্তি বিরক্ত গলায় বলল, 'অন্য কাজ নাও।'

শান্ত স্বভাবের সন্তু মলিন হেসে বলে, 'অন্য কাজ তো জানি না শান্তি। আমার বাপেও তো একাজ করেছে। প্রথম দিকে যে ডাক পেতাম, সে তো বাপের খ্যাতির জোরেই। সবাই বলত, পানু পালের ছেলে যখন কাজ নিশ্চয় ভালই করবে। বাপ আমারে হাতে ধরে এই বিদ্যে শিখিয়েছে।'

শান্তি রেগে যায়। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'রাখ দেকি তোমার বিদ্দে। কী এমন কাজের ছিরি তার আবার খাতি কটা পয়সা পাও। তোমার বাপে যদি একটা দোকান করে দিত, তাও দু' পয়সা রোজগার হত। এখনই তো লোকের কাছে চেয়ে চিন্তে চলতে হয়। কদিন পরে অবস্থা আরও খারাপ হবে। ইচ্ছে করে টান মেরে তোমার ওই সাজগোজের বাক্সটারে কংসা নদীতে ফেলে দিয়ে আসি। ওইটাই নষ্টের গোড়া। তোমার বাপ তোমাকে টাকা, পয়সা কিছু দিয়ে যেতে পারেনি, একটা ভাঙা বাড়ি আর একটা নষ্টের গোড়া বাক্স দিয়ে গেছে। ওই বাক্স গেলে তবে যদি তুমি অন্য কাজের খোঁজ করবে। এই পোড়ো বাড়িতে আমি থাকব না।'

রাগ করা তো দূরের কথা, সন্তু শান্তির রাগারাগির কথা মনে নেয় না। এই মেয়েকে সে ভালবেসে ফেলেছে। বিশেষ রকম ভালবাসা। এই ভালবাসা মুখে প্রকাশ করবার মতো ক্ষমতা সন্তুর নেই। শান্তির এটুকু রাগারাগি তো কিছুই নয়, যে অবস্থার মধ্যে সে রয়েছে, অন্য কেউ হলে কবে ছেড়েছুড়ে চলে যেত। বেচারির যাবার মতো জায়গাও নেই। বাপ–মা মরে যাওয়ায় পর গরিব মেয়েদের যাওয়ার জায়গা থাকে না। আত্মীয় পরিজনদের বাড়ি গেলে ভাবে সাহায্য চাইতে এসেছে। শান্তি পরম মমতায় এই ভাঙা সংসারকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই মেয়েকে ভাল না বেসে উপায় কী।

বউকে ঠান্ডা করবার জন্য সন্তু বলল, 'পোড়া বাড়ি কী বলছো শান্তি! আমার ঠাকুর্দের ঠাকুর্দে এই বাড়ি বানিয়েছে। তখন চারপাশে শুধু হোগলাবন, শিয়াল আর গোসাপের বাসা। বয়সের ভারে এখন একটু ভেঙেচুরে গেছে বটে, সে তো হবেই। বয়স বাড়লে হাতে পয়সা এলে মেরামত করে নেবখনে। সামনের সিজনে মনে হয় কাজ ভালই হবে। বুঝলে শান্তি, আমাদের কাজ হল আমের ফলনের মতো। এই বছর কম হয় তো পরের বছর ঢেলে দেয়।'

শান্তি ঝামটা দিয়ে বলল, 'রাখ তোমার ভাষণ। যত্ত সব মন ভুলোনো কতা। তিন বছর ধরে শুনছি, সামনের বছর আর সামনের বছর। তোমার ফলন কখনই ভাল হবে না। ভিখিরি হয়েই থাকতে হবে। ও আমি বুঝে গেছি। আমার একা থাকার কী হবে সেটা বল। ভাঙা ঘরে একা থাকতে ভয় করে।' এরপর একটু থেমে গলা নামিয়ে বলে, 'আশপাশের পাঁচ গাঁয়ের লোক জানে, স্বামী বাড়ি থাকে না। মন্দ পুরুষের তো অভাব নাই। কেউ এসে রাতবিরেতে কড়া নাড়লে কী হবে।'

সন্তু শান্তির হাত ধরে কাছে টানে। তক্তাপোষের পাশে বসায়। এক হাতে কাঁধ জড়িয়ে বলে, 'ধুস্, ওসব তোমার ভয়। আমার কাজটাই তো অমন শান্তি। আমি হলাম গিয়ে মেকাপ ম্যান। কলকাতার ফিলমি পাড়া কোথায় জানো? টালিগঞ্জ বলে একটা জায়গা রয়েছে, সেখানে সিনেমার শুটিং হয়। ওখানে মেকাপ ম্যানকে বলে শিল্পী, আর্টিস্ট। মেকাপ আর্টিস্ট। সাজগোজের আর্টিস্টও বলতে পারো। আর এটা আমার সাজগোজের বাক্স। চোখ এঁকে, ঠোঁট এঁকে, নাক এঁকে, পরচুলা পরিয়ে একটা মানুষকে আরেকটা মানুষ বানাই আমরা। একি চাট্টিখানি কথা! ঘুরে ঘুরে কাজ আমাদের। নাটক, যাত্রা, পালাগান আমাদের ছাড়া হবেই না।'

শান্তি স্বামীর হাত সরিয়ে গজগজ করে ওঠে, 'আটিস না ছাই, ছাইয়ের আটিস। ছাইয়ের আটিসের ছাইয়ের বাক্স। ওই তো দু'টো পয়সা দেয়। ডাকলেই ছোটো কেন? মুখের ওপর বলে দেবে, টাকা না পোষালে যাব না।'

শান্তি কথাটা ভুল বলেনি। মেকাপের কাজে পয়সাকড়ি কম। কলকাতা, মুম্বাইয়ের ফিল্মে কাজ করলে অন্য কথা ছিল। গাড়ি বাড়িও নাকি হয়ে যায়। সে আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে পাড়া–গাঁ, মফস্‌সল শহরের এ কাজে পয়সা পাওয়া কঠিন। রংচং দিয়ে চাষাভুষো, পাপী-তাপীদের যতই রাজা উজির, ঠাকুর দেবতা সাজাও না কেন, লোকে দাম দেবে না। কোনো কোনো পার্টি তো শুধু যাতায়াতের ভাড়াটুকু হাতে ধরিয়ে দেয়।

'এটাই এবার খুশি হয়ে রাখো সন্তু। গাঁয়ের লোক দল বেঁধে পালা করছি, পয়সা দেব কোথা থেকে পরেরবার পুষিয়ে দেব না হয়।'

মঝে মধ্যে সন্তুর মনে হত কাজ ছেড়ে দেয়। যে কাজে পয়সা নেই সে কাজ করে লাভ কী! বাবাকে দেখেই এই পেশায় নামা। ওই লোকটার আবার এই কাজ নিয়ে গর্ব ছিল বেজায়।

' বুঝলি সন্তু, এ শুধু রোজগারের কাজ নয়, এ হল শিল্পীর কাজ। একমাত্র আমরাই মানুষকে বদলে দিতে পারি। ভিখিরিকে রাজা বানাই, কিপটেকে দাতাকর্ণ,

নিপাট ভালমানুষ দুর্যোধন সেজে দ্রৌপদীর কাপড় ধরে টানাটানি করে। এই কাজ সহজ কাজ নয়। শুধু বাইরের সাজ নয়, আমাদের হাতের ছোঁয়ায় ভিতরটাও বদলে যায়। যতক্ষণ অভিনয় চলে, মঞ্চে উঠলে অভিনেতা নিজের সত্যি পরিচয়টা বেবাক ভুলে যায়। যা সে নয়, হতে পারেনি কখনও, পারবেও না, সেই মানুষটা হয়ে যায়। এ হল মেকাপের যাদু। তুই সেই যাদুর যাদুকর। আর এই মেকাপ বাক্স হল যাদু কাঠি। থিয়েটারের দলে, যাত্রাপার্টিতে, নামগান-পালাগানে গেলে কী আর এমনি এমনি খাতির করে! একবার পৌঁছে দেখিস। যতবার চাইবি চা পাবি, দু'বার সিঙারা পাবি। বেশি খিদে পেলে, ঘুগনি পাউরুটি দেবে। সবাই গদগদ গলায় বলবে, আমারটা একটু ইস্পেশাল করে দেখো বাপু। চোখের নীচের কালিটা মেরে দিও। গালে পাউডারের বাড়তি দুটো পোচ দিও হে। নইলে মাঠে জলে ঘোরার পোড়া ভাব যাবে না। ফিমেল আর্টিস্ট হলে তো কথাই নেই, চোখ আঁকতেই সময় চলে যাবে। কিছুতেই খুশি হবে না। বোঝো একবার। সে রানিই হোক আর ডাইনিই হোক। বলবে, তোমার ওই বাক্সটা খোল দেখি, দেখি কতরকম তুলি তোমার আছে।'

টানা এত কথা বলে বাবা হাসত আর হাঁপাত। হাসত গর্বে, হাঁপাত হাঁপানির অসুখে।

কথাটা ঠিক। গাঁয়ে থেকেও পাণ্ডব পাল একসময়ে ভালই ডাক পেত। থিয়েটার, যাত্রায় সাজাতে হবে। পালাগানে রাধা-কৃষ্ণ, ঠাকুর নিমাই। টিনের মেকাপ বাক্সে চোখ আঁকার রং, তুলি, পাউডার, পমেটম, কাজল যেমন থাকত, তেমন থাকত গোঁফ, দাড়ি, পরচুলো এমনকী গালের তিলটাও। কাঁধের ব্যাগে থাকত পোশাক। রাজার পোশাক, ভিখিরির ছেঁড়া ফতুয়া, কৃষ্ণের মাথার মুকুট, নিমাইয়ের নেড়া মাথার কাপড়। একসময় কলকাতার তিন-তিনটে নাটকে এক সঙ্গে কাজ করেছে পাণ্ডব। পাশাপাশি হলে কাজ। একটায় 'পৌরাণিক', তো পাশের হলে নাটকের বিষয় সামাজিক। অন্যটায় হয়তো রবি ঠাকুরের তাসের দেশ। কোনোটায় মেন মেকাপ ম্যান, কোনোটায় সহকারি, কোনোটায় পোশাক দেয়। হলগুলোও ছিল পাশাপাশি, ঢিল ছোঁড়া দূরত্ব। একটার সাজ শেষ করে দৌড় দিত। 'তাসের দেশ' হবে ক্লাবের ফাংশনের প্রথম হাফের পর। দেরি হলে ক্ষতি নেই। মেকাপের বাক্স হাতে ছুট দিত।

শুধু যে বাবার কাজের রমরমা দেখে সন্তু মজেছিল এমনটা নয়, ভিতরে টানও ছিল। কীসের টান? শিল্পী হওয়ার টান, মানুষ বদলানোর টান নাকি রক্তের টান সে যে কারণেই হোক, বাবার পেশাতেই লেগে গেল সন্তু। পাণ্ডবও ছেলেকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু শেখালে হবে কী, কাজ কই? গোড়ার দিকে ক'টা বছর খুব মন্দ হয়নি। কলকাতার চিৎপুরের এক যাত্রাপার্টি তাকে পাকাপাকি নিয়ে নেবে বলে কথা হল। তারা এক অতি বিখ্যাত যাত্রাদলের মতো বড় মানুষদের 'হিরো' বানিয়ে পালা করতে চায়। রামপ্রসাদ, মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, লালন ফকির। ঠিক হল সন্তুকে ফটো দেওয়া হবে, সেই ফটো দেখে অভিনেতাকে সাজাতে হবে। সন্তু উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এ যে বিরাট পরীক্ষা! কলকাতায় ঘুরে ঘুরে সে ফটো, ক্যালেন্ডার কিনে ফেলল। এমনই সময় পানু পাল পড়ল অসুখে। কঠিন অসুখ। দিন-রাত কাশে। একদিন কাশিতে রক্ত দেখে ছেলেকে কাছে ডাকল।

> **শান্তি স্বামীর হাত সরিয়ে গজগজ করে ওঠে, 'আটিস না ছাই, ছাইয়ের আটিস। ছাইয়ের আটিসের ছাইয়ের বাক্স। ওই তো দু'টো পয়সা দেয়। ডাকলেই ছোটো কেন।**

'কদিন পর বড় কাজ শুরু করবি, ঘর সংসার দেখার সময় পাবি না। মনে রাখবি শিল্পীর কাছে কাজ আগে, ঘর সংসার পরে। মাকে হারিয়েছিস ছোটবেলায়। তারপর থেকে সংসারটা একেবারে এলোমেলো হয়ে রয়েছে। আমিও তো এখন বিছানায় পড়ে গেলাম। যখন তখন চলে যাব। বিয়ে কর সন্তু। বয়সও বেড়েছে। বিয়ে করে ঘরদোর বউয়ের হাতে ছেড়ে ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়িয়ে কাজ কর।'

বাবার কথা বুঝল সন্তু। বিয়ে করে ফেলল সে। মেয়ে খুঁজতে সময় নিল না। কবে যাত্রাদল থেকে ডাক আসে তার ঠিক নেই। ওরা বলে রেখেছে, যে কোনও সময় না খবর পাঠাবে।

'কালই বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে চলে এসো হে। দু'মাস বাড়িমুখো হতে পারবে না কিন্তু, এই বলে দিলাম।'

একবার দেখাতেই চাপা রঙের, গোল মুখের শান্তিকে পছন্দ হল। মেয়ে গরিব ঘরের। সে হোক। ঘর সংসার সামলে দিলেই হল। বউ ঘর সামলাতে শুরু করল ঠিক, তবে যে কারণে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে, সেটাই হল না।

খবর এল, সেই যাত্রাদলটাই উঠে গিয়েছে। যে লোক টাকা ঢালত, সে নাকি ছোবড়া দড়ির ব্যবসা করছে। এর মধ্যে পাণ্ডব পালও গত হল। কাজ কমতে শুরু করল সন্তুর। পয়সা কমতে লাগল। পাড়া-গাঁয়ের পরিস্থিতি আরও খারাপ হল।

শান্তির ধমকে সন্তু গলা নামিয়ে বলল, 'বলি তো। বলি তো জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে, পয়সা না বাড়ালে চলে।'

শান্তি বলল, 'তোমাকে যে এতবার অন্য রোজগারের কথা বলি, সেকথা তো কানে তোল না।'

সন্তু বিড়বিড় করে বলল, 'দু-একটা চেষ্টা করি না এমন নয়, শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। এই তো সেদিন হলধর সামন্তর চালকলে গেলাম...আরে বাবা, আর্টিস সন্তু কি আর চালের বস্তার হিসেব রাখতে পারে?'

শান্তি চলে যেতে যেতে বলে, 'ওথাক, কোনও হিসেবই করতে হবে না তোমায়, যেদিন তোমার এই ঘর দোর ফেলে চলে যাব, সেদিনও হিসেব করতে যেও না।'

হিসেব যা-ই হোক, সত্যি একদিন সন্তুর বাড়ির দরজায় টোকা পড়ল, ফাঁকা বাড়িতে গৌরের প্রবেশ ঘটল। মেকাপ আর্টিস্ট সন্তু বুঝতেও পারল না, লোকটা মেকাপ নিয়ে এসেছে। তাকে যেমন দেখাচ্ছে আসলে সে তা নয়। অবশ্য বুঝলেই বা কী করত আটকাতে তো আর পারত না।

শান্তি চলে যাওয়ার পর ঘণ্টা দু'য়েক থম্ মেরে ভাঙা বাড়ির দাওয়ায় বসে রইল সন্তু। মনকে স্থির করল। মেয়েটা এতদিন যে তার সঙ্গে ছিল, এটাই আশ্চর্যের। তার মতো লোকের সঙ্গে একদিনও ঘর করা উচিত নয়। সংসার তো আর পালাগান নয় যে মেকাপ করে যে যার মতো অভিনয় করে যাবে। সংসার রংচঙের আড়ালে থাকে না। তাকে যতই পাউডার দেওয়া হোক, কাজল পরানো হোক যতই, সে ঝেড়ে ফেলে, হাতের চেটো দিয়ে থেবড়ে দেয়। শান্তি এখানে পড়ে থাকবে কেন তার বয়স আছে, সাধ-আহ্লাদ আছে, আদর সোহাগে রাখবার মানুষ আছে। সব থেকে বড় কথা, পেট ভরে খাওয়ার ব্যবস্থাও নিশ্চয় হবে।

যাবে না কেন? সত্যি কথাই বলত সে, আর্টিস্ট না ছাই। ছাই ছাড়া কি নিজেকে ছাইয়ের মতো লাগে সন্তুর। ছাইয়ের থেকেও অকিঞ্চিৎকর। মনে হয়, চারপাশের সবাই, গোটা দুনিয়াটাই মেকাপ করে আছে। লোভের চোখ এঁকেছে, স্বার্থের রং মেখেছে। আর সে জং ধরা সাজগোজের বাক্স নিয়ে জীবনের এতটা পথ চললই শুধু, নিজের সাজ আর হল না। চলে গিয়ে ঠিক করেছে শান্তি, বেশ করেছে।

মন শান্ত হলে জামা পড়ে সন্তু, রাতের পায়জামা ছেড়ে প্যান্ট গলিয়ে নেয়। তারপর রোজকার মতোই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। তাপ্পি দেওয়া ছাতাটাও নেয়। আজ আলাদা শুধু একটাই, হাতে মেকাপের বাক্সটা নিয়েছে। বাবার আমলের টিনের বাক্স। জং ধরেছে, তেবড়েওছে কোথাও কোথাও। যখন কাজকর্ম ছিল, নতুন বাক্সের কথা ভেবেছে সন্তু। দোকানের সামনে গিয়েওছে। শেষ পর্যন্ত আর নেওয়া হয়ে ওঠেনি। মন সায় দেয়নি। এই বাক্স তো শুধু সাজগোজের নয়, কত থিয়েটার, যাত্রা, পালাগান ভিতরে রয়েছে। কান পাতলে গান শোনা যায়, চরিত্ররা হাসে, কাঁদে, কথা বলে। একে বাতিল করতে মায়া হয়েছে। আজ মায়া কাটাবে। কোনওরকম রাগ না করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সন্তু। সে এসেছে বিশুর চায়ের দোকানে। অনেকটা সময় ধরে বসে রয়েছে। আজকাল এমনটাই সে করে। গাছের তলায়, চায়ের দোকানে অনেকটা সময় কাটায়। কাজ তো নেই।

বিশু বলল, 'আরেকবার চা খাবে সন্তুদা, দেব?'

সন্তু নীচু গলায় বলল, 'না, এবার উঠব রে। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

কিছু একটা বলতে গিয়ে থমকে গেল বিশু। একটু চুপ থেকে বলল, 'সাজগোজের বাক্স নিয়ে আজ বেরিয়েছ যে বড়। কতদিন পরে তোমারে ওই বাক্স হাতে দেখছি গো সন্তুদা। কাজ পেয়েছো, না?'

সন্তু পাশে রাখা বাক্স হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর নীচু গলায় বলল, 'না, কাজ পাইনি।'

বিশুর অবাক হয়ে থাকা চোখের সামনে দিয়ে ধীর পায়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল সন্তু। রোদ অনেক। ছাতা খুলল সন্তু। তারপর পা বাড়াল নদীর দিকে।

কংসা অতি সুন্দর নদী। ছোট বলেই বোধহয় এত সুন্দর। জল টলটলে। মেঘের ছায়া পড়লে মনে হয় বালিকার চোখ ছলছল করছে। নেমে বেশ খানিকটা হেঁটে যাওয়া যায়। তারপর জল বাড়ে। এত বেলায় নদীর পাড় থাকে নির্জন। ফুরফুরে বাতাস বয়। সে বাতাস ঠান্ডা। খুবই ভাল লাগে। এখান থেকে নদীতে পৌঁছোতে মিনিট সাত হাঁটতে হবে সন্তুকে। সে লাগুক, তাড়া তো নেই।

অতিমারী

সিজার বাগচী

নিজের রুমে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সংঘমিত্রা। স্কুলে ঢুকে পরপর তিনটে ক্লাস। বুধবার বড় ধকল যায়। আজ আবার স্টেশন থেকে অটো-টোটো পাওয়া যায়নি। রিকশাও ছিল না। কেউ একজন মারা গিয়েছে। তাই সব বন্ধ। শোক পালন চলছে। রোদে প্রায় দেড় কিলোমিটার হেঁটে আসতে হয়েছে। এসে যে দু'মিনিট বসবে, সেই সুযোগ পায়নি।

কোভিডের পর মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে আসে না। অনেকে স্কুলের সময় টিউশন পড়তে যায়। অভিভাবকদের বুঝিয়েও কাজ হয়নি। তাই ক্লাস ফাঁকি দেওয়া যায় না। সংঘমিত্রা যে প্রধান শিক্ষিকা। রুমাল দিয়ে ভাল করে ও মুখ মুছল। আজ আগে বেরোতে পারলে ভাল। ছেলের জ্বর। অভিষেক অফিসে বেরিয়েছে। ফিরবে রাতে। ছুটি নেওয়ার উপায় নেই। সংঘমিত্রা ভেবেছিল ডুব দেবে। কিন্তু সামনের সপ্তাহ থেকে গরমের ছুটি। এখন কামাই করা মুশকিল। আট বছরের ছেলেকে শাশুড়ির জিম্মায় রেখে এসেছে।

সংঘমিত্রা জল খেল।

এমন সময় একটি মেয়ে উঁকি দিল। বলল, 'বড়দিমণি, আসব?'

সংঘমিত্রা ইশারায় ভিতরে আসার নির্দেশ দিল। মেয়েটি ক্লাস সিক্সে পড়ে। নাম, দীপালি নস্কর। রোগা, ফর্সা চেহারা। চোখ দু'টো জ্বলজ্বলে।

দীপালি নীচু স্বরে বলল, 'দিদিমণি, পাঁচ হাজার টাকা ধার দিতে পারেন? খুব দরকার!'

অবাক হয়ে দীপালিকে মাপল সংঘমিত্রা। ওদের স্কুলে যে ছাত্রীরা পড়ে, তাদের বেশির ভাগ নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসে। সেখানে পাঁচ হাজার টাকা মানে অনেক টাকা।

সংঘমিত্রা জানতে চাইল, 'এত টাকা দিয়ে কী করবি?'

মেয়েটা ইতস্তত করল। বলল, 'খুব বিপদ দিদিমণি। মা... মাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে...'

হাঁ হয়ে গেল সংঘমিত্রা। বলল, 'তুলে নিয়ে গিয়েছে? কে?'

দীপালি হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল। বলল, 'জানি না দিদিমণি। কাল বিকেল থেকে মা ফেরেনি। আজ যখন স্কুলে আসছি, তখন রাস্তায় একজনের সঙ্গে দেখা। কাকিমার বয়সি। সে বলল--- তোর মাকে আমরা আটকে রেখেছি। হাইরোডের ধারে যে গোল চত্বর, সেখানে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বিকেলবেলা আসবি। না হলে তোর মায়ের সর্বনাশ...'

হকচকিয়ে গেল সংঘমিত্রা। দশ বছর ধরে এই স্কুলে পড়াচ্ছে। ছ'বছর হল প্রধান শিক্ষিকা। এমন পরিস্থিতিতে কখনও পড়েনি। ও বলল, 'মহিলাকে চিনিস? আগে দেখেছিস?'

'না দিদিমণি,' জড়ানো গলায় জবাব দিল দীপালি।

'তোর বাবা কোথায়?'

'বাবা কাজ করে গুজরাতে। পনেরো দিনের জন্য এসেছিল। কাল ভোরে বেরিয়ে পড়েছে। কাজের জায়গায় ফিরে যাবে। বাবা এখন ট্রেনে। সঙ্গে মোবাইল ফোন নেই। আগামিকালের আগে বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব না।'

'বাড়িতে আর কে কে আছে?'

' আমি, মা আর ঠাকুরমা। ঠাকুরমা অসুস্থ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। মা পরের বাড়ি কাজ করে। কাল মা বাড়ি ফেরেনি। ঠাকুরমা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। খালি ঠাকুরকে ডাকছে। আমাকে বলল--- তুই স্কুলে যা। বাড়িতে থাকলে আরও মন খারাপ করবে। তাই এসেছি। রাস্তায় কাকিমা ওই কথা বলল।'

নীচের ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ ভাবল সংঘমিত্রা। এ তো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। স্কুলের বাকিদের জানানো দরকার। চেয়ার থেকে উঠে ও বলল, 'চল তো আমার সঙ্গে।'

প্রধান শিক্ষিকার রুমের পাশে অফিসঘর। তারপরে টিচার্সরুম। দীপালিকে নিয়ে সংঘমিত্রা সেখানে ঢুকল। বেশির ভাগ শিক্ষিকা ক্লাসে। শুধু অদিতিদি এবং শান্তা বসে।

সংঘমিত্রা ঢুকে দু'জনকে সব বলল। অদিতিদি চমকে উঠলেন। বললেন, 'এ তো কিডন্যাপিংয়ের কেস। থানায় ইনফর্ম করো।'

সংঘমিত্রা বলল, 'তাই ভেবেছি।'

অদিতিদি কাছে থাকেন। দীপালিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর বাড়ি কোথায়?'

'মান্নাপাড়ায়।'

'ওখানে আর কোনও বন্ধু থাকে?'

'না দিদি। পাশে হরিসভার কাছে অন্তরাদের বাড়ি।'

অদিতিদি আরও কিছু প্রশ্ন করছিলেন। সংঘমিত্রা শোনার জন্য দাঁড়াল না। রুমে এসে থানায় ফোন করল।

আইসি শুভ্রনীল পাকড়াশির সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে পরিচয়। একবারে ফোন ধরলেন। সংঘমিত্রা পুরো ঘটনার কথা বলল।

শুভ্রনীল প্রশ্ন করলেন, 'মেয়েটি এখন কোথায়?'

'স্কুলে।'

'ওখানে থাকতে বলুন। স্কুলের পর যেন টাকা দেওয়ার ছুতোয় গোল চত্বরে যায়। সিভিল ড্রেসে পুলিশ থাকবে। আমিও থাকব। দীপালি যেন দূর থেকে সেই কাকিমাকে চিনিয়ে দেয়। কোনও স্পেসিফিক টাইম বলেছে?'

'না। শুধু বিকেলবেলা।'

'হুম। এটাও গোলমালের।'

'ওদের কোনও বিপদ হবে না তো?'

'ভরসা রাখুন। মুশকিল কী জানেন, যে সব পরিবারে স্বামীরা বাইরে কাজ করে, সেখানে এই ধরনের ক্রাইম আজকাল দেখা যাচ্ছে। আপনি ভাবছেন মহিলাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা তা নাও হতে পারে। মহিলার হয়তো কারও সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। সেই লোক হয়তো কোনও গ্যাংয়ের মেম্বার। না জেনে মহিলা খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছে।'

ফোন রেখে চুপ করে বসে থাকল সংঘমিত্রা। পুলিশের হাতে ব্যাপারটা ছাড়া কি ঠিক হচ্ছে? স্কুলের সম্মান

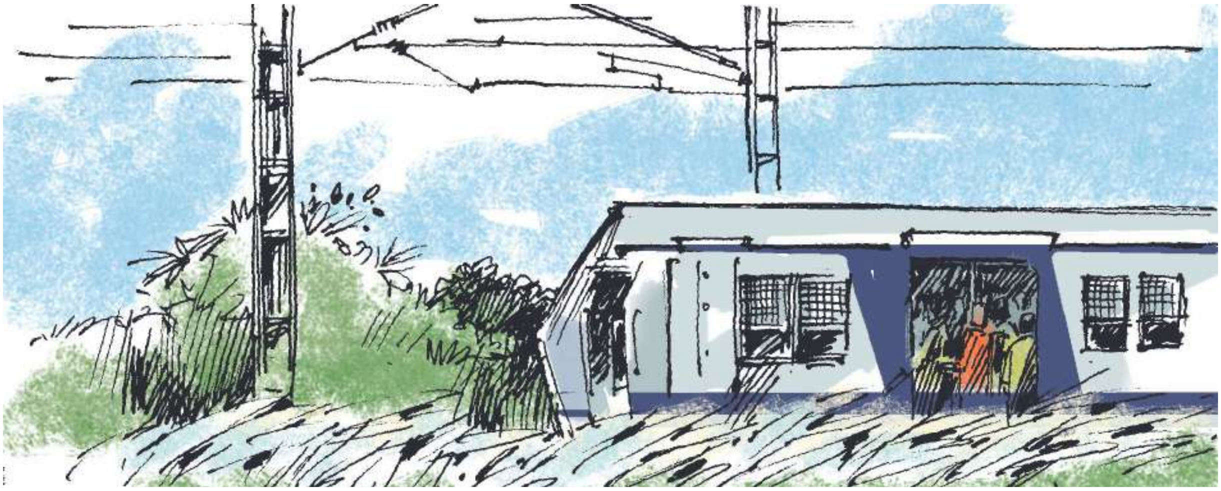

জড়িয়ে। ও মোবাইল ঘেঁটে অমিতাভ গুহর নম্বর বের করল। এক মাঝারি নিউজ় চ্যানেলের স্থানীয় প্রতিনিধি। অল্পবয়সি। বেশ চনমনে।

অমিতাভকে ফোনে সব জানাল সংঘমিত্রা। শুভ্রনীল পাকড়াশির সঙ্গে কী কথা হয়েছে তাও। অমিতাভ শুনে বলল, 'আমিও থাকব দিদি। ভয় হচ্ছে, বাচ্চাটা না বিপদে পড়ে। শুভ্রনীলবাবু ভুল কিছু বলেননি।'

সংঘমিত্রার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। তখনই অদিতিদি এবং শুচিস্মিতা এল।

অদিতিদি বললেন, 'থানায় জানালে?'

'হ্যাঁ। অমিতাভকেও।'

'ভাল করেছ। আগে টিভিতে দেখতাম। এখন আমাদের স্কুলে চলে এল।'

সংঘমিত্রা বলল, 'ছুটি হলে দীপালিকে আমার কাছে পাঠাবেন। পুলিশের কথামতো ওকে কিছু নির্দেশ দিতে হবে।'

শুচিস্মিতা মাথা নেড়ে বলল, 'ওদের শেষ ক্লাস আমি নেব। তখন বলে দেব।'

কিছুক্ষণ আলোচনা করে দু'জন বেরিয়ে গেল। ছটফট করতে থাকল সংঘমিত্রা। বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করল। শাশুড়ি জানালেন, বুবাই ঘুমিয়েছে। দীপালির কথা বলতে গিয়েও সংঘমিত্রা চেপে গেল। শাশুড়ি ভয় পেয়ে যেতে পারেন। অফিসের হেড ক্লার্ক প্রণবেশদা এবং চিরন্তন এসে দেখা করল। দু'জনে শুনেছে দীপালির ঘটনা।

সংঘমিত্রা বলল, 'আপনারা ছুটির পরেও থাকবেন। দরকার হতে পারে।'

প্রণবেশদা বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

চিরন্তনও সায় দিল।

কোনও কাজ করতে পারল না সংঘমিত্রা। ছুটির ঘণ্টা বাজতে ও উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে থাকল কখন দীপালি আসবে! অমিতাভ ফোনে বলল, 'হাইরোডের ধারে গোল চত্বরে এসে গিয়েছি। মেয়েটি রওনা দিলে জানাবেন।' শুভ্রনীলও জানিয়েছেন, 'ছুটির পর মেয়েটিকে নিয়ে গেটের বাইরে আসবেন। ওখানে আমাদের লোক দাঁড়িয়ে। আপনার সঙ্গে মেয়েটাকে দেখলে চিনে নেবে। ফলো করবে।'

কিন্তু দীপালির দেখা নেই।

শুচিস্মিতাকে ফোন করল সংঘমিত্রা। বলল, 'দীপালি তো আসেনি?'

'সেকি! ক্লাসে ঢুকেই ওকে বললাম। দিব্যি ঘাড় নাড়ল। দাঁড়াও দেখছি।'

উত্তেজনায় স্কুলের করিডরে চলে এল সংঘমিত্রা। সব ক্লাসের মেয়েরা তরতর করে বেরোচ্ছে। তাদের মধ্যে দেখতে পেল অন্তরাকে। যার বাড়ি হরিসভার কাছে।

সংঘমিত্রা হাঁক দিল, 'অ্যাই অন্তরা, দীপালিকে দেখেছিস? মান্নাপাড়ায় বাড়ি।'

বড়দিমণির ডাকে এগিয়ে এল অন্তরা। বলল, 'ও তো বেরিয়ে গেল।'

'বেরিয়ে গেল!'

হ্যাঁ, ছুটি হতেই চলে গেল।'

দিশেহারা হয়ে গেল সংঘমিত্রা। এবার কী হবে? ওদিকে শুভ্রনীল এবং অমিতাভ দাঁড়িয়ে।

শুচিস্মিতাও চলে এসেছে। সংঘমিত্রাকে দেখে বলল, ' দীপালি আসেনি?'

অন্তরাকে দেখিয়ে সংঘমিত্রা বলল, 'ও বলছে,

দীপালি বেরিয়ে গিয়েছে।'
'মানে!'
অন্তরা বলল, 'দিদি, দীপালি বাড়ি গিয়েছে।'
'তুই কী করে জানলি?' শুচিস্মিতা প্রশ্ন করল।
'ক্লাসে বলছিল, সোজা বাড়ি যাবে।'
শুচিস্মিতা আরও প্রশ্ন করত। সংঘমিত্রা বাধা দিল। আগে দীপালিকে ধরা দরকার। না হলে সব বানচাল। অন্তরার হাত ধরে ও বলল, 'আয় তো।'
রুমে এসে ফোন করল অমিতাভকে। সমস্যার কথা বলল।
অমিতাভ বলল, 'হাইরোড থেকে আপনার স্কুলে যাওয়ার যে রাস্তা, সেটা ধরে এগোচ্ছি। মেয়েটি দেখতে কেমন?'
'দীপালির বন্ধু বলছে, ও বাড়ির দিকে হাঁটা দিয়েছে!'
'হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। আমি এদিকে নজর রাখছি। আপনি ওর বাড়ি চলে যান।'
দীপালিকে কেমন দেখতে অমিতাভকে বর্ণনা করল সংঘমিত্রা। অন্তরাকে বলল, 'দীপালির বাড়ি যাব। চল।'
অন্তরাকে নিয়ে বেরোচ্ছে, অদিতিদির সঙ্গে দেখা।
অদিতিদি বললেন, 'আমি স্কুলে আছি। কী হল জানিও।'
স্কুলের গেট পেরিয়ে বড় রাস্তা।
অন্তরা বলল, 'দিদি, আমরা ডান দিকে যাব।'
বাঁ দিকে হাইরোড। সংঘমিত্রা বুঝল, দীপালির বাড়ি উলটো দিকে। কিছুদূর এগিয়েছে, শুভ্রনীলের ফোন এল।
শুভ্রনীল বললেন, 'আমার লোক বলছে, আপনি মেয়েটিকে নিয়ে অন্য রাস্তায় যাচ্ছেন। শেষ মুহূর্তে প্ল্যান চেঞ্জ হল নাকি?'
সংঘমিত্রা মনে মনে জিভ কাটল। শুভ্রনীলকে জানানো উচিত ছিল। তালেগোলে ভুল হয়েছে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ও ছুটির পরের ঘটনা বলল শুভ্রনীলকে। কথার মাঝে দেখল অমিতাভর ফোন ঢুকছে। আগের ফোন ছেড়ে ও ধরল অমিতাভকে।
অমিতাভ বলল, 'ওই রকম চেহারার মেয়ে রাস্তায় দেখলাম না! কোনও শর্টকাট নেই তো?'
'থাকলেও আমি বলতে পারব না।'
অমিতাভ আরও কিছু বলত, লাইন কেটে গেল। সংঘমিত্রা ঘুরিয়ে ফোন করল না। অন্তরার সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে ওর হাঁপ ধরে যাচ্ছে। তার ওপর বেশ গরম। দরদর করে ঘাম হচ্ছে। বুবাইয়ের চিন্তা এল। অভিষেককে কি ফোন করলে ভাল হত?
বড় রাস্তার ধারে এক সরু গলির সামনে এসে অন্তরা বলল, 'এটাই মান্নাপাড়া।'
সরু রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট টালির ঘর। একটার সামনে ছাগল বাঁধা। তিন-চারটে মুরগি চড়ছে। অন্তরা গলিতে ঢুকল। পিছু পিছু সংঘমিত্রা। চার-পাঁচটা টালির ঘর টপকে গিয়ে অন্তরা বলল, 'এই যে দীপালিদের বাড়ি।”
সেই বাড়ির সামনের কাঁচা নর্দমা উপচে পড়ছে পাঁকে। নর্দমার পর দু'টো ইট পাশাপাশি পেতে রাস্তা করা। সেই রাস্তা গিয়ে পৌঁছেছে ক্ষয়ে যাওয়া এক কাঠের দরজার সামনে। দরজা খোলা। তবে ওপাশে অন্ধকার।
অন্তরা হাঁক দিল, 'দীপালি! অ্যাই দীপালি!'
ভিতরের অন্ধকার থেকে কেউ জবাব দিল, 'কে রে?'
অন্তরা বলল, 'বড়দিমণি এসেছেন। দীপালিকে ডাকছেন।'
এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। কাঠির মতো সরু চেহারা। গাল বসা। নাক খাড়া। সংঘমিত্রাকে দেখে বলল, 'দীপালি তো এই স্কুল থেকে ফিরল। হাত-পা ধুচ্ছে।'
'আপনি?'
'আমি দীপালির মা।'
হতভম্ব হয়ে গেল সংঘমিত্রা। কী বলবে ভেবে পেল না। ঘরের অন্ধকার থেকে আরও একজন বেরিয়ে এলেন। সেই লোকের চেহারাও রোগা। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে হাফ হাতা জামা আর নোংরা পাজামা। সংঘমিত্রাকে এক ঝলক দেখে মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?'
সংঘমিত্রা ততক্ষণে অল্প ধাতস্থ হয়েছে। ওই লোকের উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি দীপালির স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। আপনি?'
'আমি দীপালির বাবা। মেয়ে কি কিছু করেছে?'
সংঘমিত্রা বলতে যাচ্ছিল, শুভ্রনীল ফোন করলেন।
জানতে চাইলেন, 'মেয়েটার ট্রেস পেয়েছেন?'
'হ্যাঁ। বাড়িতে আছে। এমনকি বাবা-মাও।'
'বাড়ি কোথায়?'
'মান্নাপাড়ায়।'
অন্তরা কিছুই বুঝতে পারছিল না। সংঘমিত্রা ফোন ছেড়ে ওকে বলল, 'তুই বাড়ি যা। কাল ঠিক সময়ে স্কুলে

আসবি।'

অন্তরা চলে গেল।

সংঘমিত্রা বলল, 'দীপালি কোথায়? ডাকুন!'

দীপালি বেরিয়ে এসে মায়ের পাশে দাঁড়াল। এক বৃদ্ধাও উঁকি দিলেন। বোধ হয় দীপালির ঠাকুরমা।

সংঘমিত্রা কড়া গলায় দীপালিকে বলল, 'আজ সকালে তুই এসে পাঁচ হাজার টাকা চাইলি! বললি, কারা তোর মাকে গতকাল ধরে নিয়ে গিয়েছে। এদিকে তোর বাবা গুজরাত রওনা দিয়েছে ট্রেনে। সঙ্গে মোবাইল নেই। ঠাকুরমাও নাকি এত অসুস্থ যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। এখন তো দেখছি, তেমন কিছুই হয়নি।'

দীপালি চোখ বড় বড় করে বলল, 'আমি! কোথায় দিদিমণি! আমি তো ওই কথা আপনাকে বলিনি।'

আশ্চর্য হয়ে সংঘমিত্রা বলল, 'তুই বলিসনি!'

'নাহ।'

কী জবাব দেবে এক মুহূর্তের জন্য ভেবে পেল না সংঘমিত্রা।

দীপালি ফের নির্বিকার গলায় বলল, 'আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।'

'ভুল হচ্ছে!' সংঘমিত্রা গলা চড়াল, 'তুই সকালে এসে আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চাসনি?'

এবার দীপালির বাবা বললেন, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। ওর মা তো বাড়িতে। আমিই বা কেন গুজরাত যাব? এখানে কাঠের কাজ করি। সকালে বেরিয়ে এই ফিরেছি।'

দীপালির মাও সায় দিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে অমন নয়।'

সংঘমিত্রা দেখল, আশপাশের বাড়ি থেকে লোক জড়ো হচ্ছে। নিশ্চয়ই দীপালিদের চেনাশোনা। সেখানে ও একা। ঠিক তখনই দু'জন কনস্টেবল এবং একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার নিয়ে শুভ্রনীল পাকড়াশি এসে হাজির হলেন।

পুলিশকে দেখে দীপালির বাবা-মায়ের মুখে হালকা ভয়ের ছায়া পড়ল। দীপালি একই ভাবে দাঁড়িয়ে।

সংঘমিত্রা বলল, 'তোর কথা শুনে থানায় ইনফর্ম করেছিলাম। পুলিশ চলে এসেছে। এখন বলছিস, তুই ওই কথা বলিসনি!'

শুভ্রনীল কিছু বললেন না। শুধু সংঘমিত্রা এবং ওই পরিবারকে জরিপ করতে লাগলেন।

দীপালি বলল, 'যে দোষ করিনি, তা কেন স্বীকার করব বড়দি? মনে হয়, আমাদের ক্লাসের অন্য দীপালির সঙ্গে আপনি আমাকে গুলিয়ে ফেলেছেন।'

সংঘমিত্রার খেয়াল হল, ক্লাস সিক্সে আরও একটি মেয়ের নাম দীপালি। ওই দীপালির পদবি মণ্ডল। এই দীপালির সঙ্গে ওই দীপালির চেহারার অনেক ফারাক। দীপালি মণ্ডল গোলগাল। গায়ের রং চাপা। দাঁতগুলো অল্প ফাঁক ফাঁক। দু'পাশে বিনুনি দুলিয়ে স্কুলে আসে।

সংঘমিত্রা মোবাইলে এই দীপালির ছবি তুলল। সেই ছবি স্কুলের শিক্ষিকাদের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে পোস্ট করে লিখল --- 'আজ সকালে এই দিপালিকে নিয়ে স্টাফ রুমে গিয়েছিলাম তো?'

শান্তা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল --- 'হ্যাঁ।'

> অপরাধী ওই বাচ্চাটা নয়। আপনারা।' দু'জনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল। সংঘমিত্রার খারাপ লাগছিল দীপালির জন্য। মেয়েটা এখন কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

সংঘমিত্রা জানাল ---'মেয়েটা এখন সবার সামনে বলছে, ও নাকি যায়নি। অন্য দীপালি গিয়েছিল।'

এবার অদিতিদি ভয়েস মেসেজ পাঠালেন, 'আমরা সাক্ষী। দীপালি নস্কর এসেছিল।'

সংঘমিত্রা তবু আশ্বস্ত হল না। দীপালির জন্য ও থানার আইসি-কে টেনে এনেছে। একজন সাংবাদিককে ছুটিয়েছে। এখন দুম করে মেয়েটা সব অস্বীকার করায় ওর সম্মানে লেগেছে। চিরন্তনকে ফোন করে সংঘমিত্রা বলল, 'অফিসে দীপালি নস্কর আর দীপালি মণ্ডলের যে ছবি আছে পাঠাও তো।'

শুভ্রনীল গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়ে। পুলিশকে দেখে ভিড় আরও বেড়েছে। অমিতাভও মোটরবাইকে চেপে চলে এসেছে।

সংঘমিত্রা বলল, 'আজ স্কুলের স্টাফরুমে তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম। যে দু'জন দিদিমণি ছিলেন, তাঁরা ছবি দেখে বলছেন, ওটা তুই, অন্য কেউ নয়। এখন বলছিস, আমি দীপালি মণ্ডলের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি!'

'আমার মেয়ে কেন মিথ্যে কথা বলবে?' দীপালির মা ফোঁস করে উঠল।

দীপালির বাবাও নরম গলায় মেয়েকে প্রশ্ন করল, 'তুই কি সত্যিই বড়দিমণির কাছে গিয়ে টাকা চেয়েছিলি?'

দু' দিকে মাথা নেড়ে দীপালি বলল, 'না বাবা।'

সংঘমিত্রার বড় অসহায় লাগল। ওর মা ছিল স্কুল শিক্ষিকা। ছোটবেলায় দেখত মাকে কত সম্মান করছে স্কুলের মেয়েরা। অসুস্থ হলে খোঁজ নিচ্ছে। মা অবসর নেওয়ার পরও অনেক ছাত্রী মাঝে মাঝে বাড়িতে চলে আসত। তখন তারা আর স্কুলে নেই। কেউ বিয়ে করে দূরে চলে গিয়েছে। কেউ ভাল চাকরি করছে। তবু লতা দিদিমণিকে ভুলতে পারেনি। মাকে দেখতে দেখতে সংঘমিত্রাও ঠিক করেছিল, বড় হয়ে শিক্ষিকা হবে। ছাত্রী তৈরি করবে। স্কুলে চাকরি পাওয়ার পর সেই আদর্শকে মাথায় রেখে ও কাজ করেছে। মেয়েদের ক্লাস নিয়েছে ঠিক মতো। ক্লাসের বাইরেও ওদের পাশে থেকেছে। স্কুলের মেয়েরা যখনই কোনও প্রদর্শনী করেছে, বিতর্কসভায় যোগ দিয়েছে, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে, সংঘমিত্রা প্রতিবার ওদের তালিম দিয়েছে। স্কুল ছুটির পর ঘণ্টার পর ঘণ্টা খরচ করেছে এই কাজে। এমনকি প্রদর্শনীর চার্ট রবিবার সকালে বাড়িতে বসে বানিয়েছে। অন্যরা আড়ালে কম ঠাট্টা করেছে! তবু সংঘমিত্রা হাল ছাড়েনি। কখনও মনে করেনি, সময় নষ্ট হচ্ছে।

এখন ক্লাস সিক্সের এক মেয়ে কত অনায়াসে ওকে মিথ্যেবাদী প্রমাণ করতে চাইছে। সেই অপমান সংঘমিত্রা মেনে নিতে পারছে না। শুভ্রনীল কিংবা অমিতাভ কী ভাবছেন ওর সম্পর্কে!

চিরন্তন ততক্ষণে দুই দীপালির ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে। ছবি দু'টো সংঘমিত্রা পোস্ট করল শিক্ষিকাদের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে। ফোনে ধরল অদিতিদিকে। বলল, 'গ্রুপে দুটো ছবি দিয়েছি। দেখলেন?'

অদিতিদি জবাব দেওয়ার আগে সংঘমিত্রা ফোন লাউডস্পিকারে দিল। জটলার মাঝখানে শোনা গেল অদিতিদির গলা, 'হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে দীপালি নস্কর এসেছিল স্টাফরুমে। আমি ছিলাম তখন। ওকেই দেখেছি। কেন? এখন কি অস্বীকার করছে?'

'পুরোপুরি।'

অদিতিদি বললেন, 'আমি সাক্ষী দেব দীপালি নস্কর এসেছিল। তেমন হলে এখনই যাচ্ছি বলতে।'

সংঘমিত্রা জোর পেল। ফোন কেটে দীপালির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নিজের কানে শুনলি তো? অদিতি দিদিমণি এসে পুলিশের কাছে সাক্ষী দেবেন দীপালি মণ্ডল নয়, তুই এসেছিলি টাকা চাইতে। সেটা হলে স্কুলের খাতা থেকে তোর নাম কাটা যাবে। শুধু কাটা যাবে না, অন্য স্কুল তোকে ভর্তি নেবে না।'

দীপালি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

সংঘমিত্রা বলল, 'যদি মনে করিস, বাবা-মা আছে তাই আমার কিছু হবে না, তা হলে ভুল ভাবছিস। আমি কঠোর ব্যবস্থা নেব দীপালি।'

'পুলিশের সামনে মিথ্যে কথা বললে কী হয় জানো?' শুভ্রনীল এতক্ষণে গম্ভীর গলায় বললেন, 'সত্যি কথা বলো তো এবার!'

শুভ্রনীলের থমথমে চেহারা দেখে দীপালি ঢোঁক গিলল। বলল, 'আমাকে অনুরাধা বলেছিল টাকা চাইতে। ওর মাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গিয়েছে।'

'কোন অনুরাধা?' শুভ্রনীল জানতে চাইলেন।

'ক্লাস এইটে পড়ে।'

দীপালির মা তড়বড়িয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল।

শুভ্রনীল ধমক দিলেন, 'আপনি কথা বলবেন না। আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি।'

দীপালির মা দমে গেল।

শুভ্রনীল বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, ক্লাস এইটের অনুরাধার কথা বলছিলে। কী বলেছিল অনুরাধা?'

'বলেছিল, কারা যেন ওর কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছে...'

'ফের মিথ্যে কথা!' শুভ্রনীল পুলিশি হুঙ্কার দিলেন, 'সত্যিই থানায় ধরে নিয়ে যাব।'

দীপালি কুঁকড়ে গেল। মিনমিন করে বলল, 'ভুল হয়ে গিয়েছে।'

'কী ভুল হয়েছে?'

'আমি আর কখনও বড়দিমণির কাছে টাকা চাইব না।'

'টাকা চেয়েছিলে কেন?'

দীপালি ফের চুপ।

'কী হল? উত্তর দিচ্ছ না যে! কেন চেয়েছিলে?'

'আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলাম।'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগে না। রোজ রোজ বাবা-মায়ের ঝগড়া হয়। বাবা রাতে মদ খেয়ে এসে মাকে পেটায়। সেই রাগে মা আমাকে মারে। আমাকে কেউ ভালবাসে না।'

শুভ্রনীল তাকালেন দীপালির বাবা-মায়ের দিকে। বললেন, 'আমার উচিত আপনাদের অ্যারেস্ট করা। অপরাধী ওই বাচ্চাটা নয়। আপনারা।'

দু'জনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকল। সংঘমিত্রার খারাপ লাগছিল দীপালির জন্য। মেয়েটা এখন কাঁদছে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কিন্তু ওর কিছু করার নেই। শুভ্রনীলই বা কী করবেন?

আরও কিছুক্ষণ গজগজ করে শুভ্রনীল ফিরলেন সংঘমিত্রার দিকে। বললেন, 'চলুন, আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসি। আজ তো এদিকে রিকশা-টোটো বন্ধ।'

সংঘমিত্রা ক্লান্ত গলায় বলল, 'আর কোনও ফরম্যালিটি আছে?'

'না, না। একেবারে ছোট বাচ্চা। প্যাথেটিক,' --- শুভ্রনীল দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

অমিতাভ বলল, 'দিদি, আমার মোটরবাইকের পিছনে বসতে পারেন।'

সংঘমিত্রা রাজি হল না। মোটরবাইকের চেয়ে পুলিশের গাড়িতে যাওয়া ভাল। শেষ পর্যন্ত তাই করল। দেরি হওয়ায় ট্রেন ফাঁকা পেল। মহিলা কামরায় বসার জায়গাও। ট্রেনে যেতে যেতে ভাবনাগুলো ওর পিছু ছাড়ল না। কবে থেকে ছোট ছোট মেয়েগুলো এমন পালটে গেল? ওদের শিক্ষায় কি কোনও ভুল থেকে যাচ্ছে? কোভিড পর্বের পর থেকে সংঘমিত্রা লক্ষ করেছে এই পরিবর্তন। এক অতিমারী থেকে জন্ম নিচ্ছে আরও অনেক অতিমারী।

ট্রেনের জানলা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। চোখ বন্ধ করল সংঘমিত্রা। বুবাইয়ের মুখ মনে পড়ল। দেরি দেখে ছেলে ইতিমধ্যে দু'বার ফোন করেছে। আচমকা ওর মোবাইল আবার বেজে উঠল। এবার বুবাই নয়, অচেনা নম্বর। আজকাল প্রচুর ভুলভাল ফোন আসে। ধরতে ইচ্ছে করল না সংঘমিত্রার। তারপর খেয়াল হল, দীপালিকে নিয়ে সারাদিন গিয়েছে। হয়তো সেই সূত্রে কোনও ফোন। তাই ও ফোন ধরল।

ওপাশ থেকে ঝড়ের মতো আছড়ে পড়ল এক মহিলার গলা, 'দিদিমণি, আমি শুভ্রার ঠাকুরমা বলছি।'

'কোন শুভ্রা?' বিরক্ত হয়ে বলল সংঘমিত্রা।

'আপনার স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। শুভ্রা আজ স্কুলের পর বাড়ি ফেরেনি। সেই থেকে খুঁজছি। স্কুলে গিয়েছিলাম। শুনলাম, আপনি বেরিয়ে গিয়েছেন। সারা সন্ধে খুঁজে জানতে পারলাম, ওদের ক্লাসের অনিমার সঙ্গে শুভ্রা পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে!'

'হ্যাঁ, অনিমা নাকি বিয়ে করবে। শুভ্রাকেও সঙ্গে নিয়েছে। বলেছে নাকি নতুন বর জুটিয়ে দেবে। দু'জনে যে কোথায় গিয়েছে, কিচ্ছু জানা যাচ্ছে না। অনেকের কাছে খোঁজ করে এখন আপনার নম্বর পেলাম। তাই ফোন করছি।'

সংঘমিত্রা বুঝতে পারল আর-একটা ঝড় আসছে। এবার কী করবে? শুভ্রনীলকে ফের ফোন করবে। বলবে, নতুন সমস্যার ব্যাপারে? যদি শুভ্রার ঠাকুরমা পরে পালটি খায়? চোদ্দো বছরের মেয়ে বিয়ে করার জন্য পালিয়েছে। এই খবর জানাজানি হলে, ভবিষ্যতে শুভ্রার বিয়ে নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল সংঘমিত্রা। মাথা ফাঁকা।

ওদিকে শুভ্রার ঠাকুরমা বলে চলেছেন, 'আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আমার নাতনি, আপনার স্কুলের ছাত্রী শুভ্রাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না... হ্যালো... মেয়েটার হয়তো এতক্ষণে... হ্যালো...'

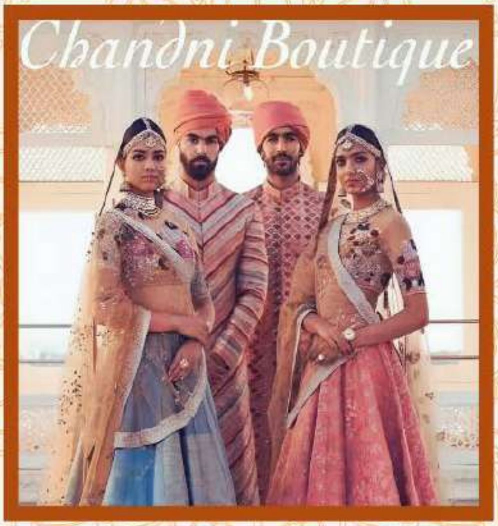

We specialize in a variety of handloom pure silk sarees and ethnic-wear. Banarasi, Kalamkari, Kanchivaram, Jamdani, Kanthastitch, Lambani, Ajrak, Chikankari, Parsi, Ikkat, Blockprint,Paithani and many more.

Shashi Sen
+1 916-259-9044
9223 Fruited Plain way
Elk Grove, California

chandni_boutique9298
Chandni.Boutique13

হুডানিট

ইন্দ্রনীল সান্যাল

'একটা ভাল হুডানিটে কী কী উপাদান থাকে?' ঘরে উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল বেঙ্গল মেডিকেল কলেজের অটপ্সি সার্জন দীপশিখা মুখার্জি।

'ঘর' মানে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে অবস্থিত চারতলা 'পুরী নিবাস'-এর ড্রইং রুম। এই বাড়ির একজন বিখ্যাত বাসিন্দা হলেন অনন্যা দে, যিনি বাংলার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল গণমোর্চার নেত্রী এবং মন্ত্রী। পুরী নিবাসের দ্বিতীয় বিখ্যাত বাসিন্দা হলেন অনন্যার দাদা, ইংরিজি গোয়েন্দা উপন্যাস লেখক প্রিয়ব্রত দে। পাঠককূল যাঁকে 'পিডি' বলে ডাকেন। তাঁর লেখা বারোটি 'হুডানিট' বা গোয়েন্দা উপন্যাস থেকে সাতটি হিন্দি ও বাংলা ছবি হয়েছে।

কাদের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলা হল?

বসার ঘরের সোফায় বসে আছেন অনন্যা, তাঁর মা মানসী, গণমোর্চা পার্টির মহিলা শাখার নেত্রী লহরী সেন এবং রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল 'জনশক্তি'-র নেতা বাদল মণ্ডল। এঁরা ছাড়া ঘরে উপস্থিত লালবাজারের হোমিসাইড শাখার অ্যাডিশনাল অফিসার-ইন-চার্জ বরুণ সরকার। মানসীর বড় ছেলে পিডি এই মিটিং-এ নেই। কারণ তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে গত পরশু

রাতে। এই নিয়ে কথা বলতেই দীপশিখা আর বরুণের এখানে আসা।

'হুডানিটের কথা আসছে কেন? দাদা তো আত্মহত্যা করেছে।' বরফ-ঠান্ডা গলায় বললেন অনন্যা। জননেত্রীর তীব্র চাহনি দেখে ঘাবড়াল দীপশিখা। কারণ তার হাতে ঠিক আধঘণ্টা সময় আছে। এখন দুপুর দেড়টা। দুটোর মধ্যে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন সে এখনও পিডি-র ময়না তদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করেনি। বরুণকে ব্যাখ্যা করতে হবে কেন সে এখনও পিডি-র সুইসাইডের কেস ফাইল ক্লোজ় করেনি। ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে দু'জনের জন্যেই শোকজ় এবং সাসপেনশানের খাঁড়া নাচছে।

জলের বোতল থেকে ঢকঢক করে অনেকটা ঠান্ডা জল খেয়ে দীপশিখা বলল, 'হু হ্যাজ় ডান ইট?' বাংলায় --- হত্যাকারী কে? প্রয়াত পিডি লিখে গিয়েছেন, সার্থক হত্যা কাহিনির বুননে ন'টি উপাদান লাগে।'

'সেগুলো কী?' জানতে চাইলেন আশি পেরনো মানসী। সাদা থান পরা মহিলার কথাবার্তা এবং হাঁটাচলায় বয়সের বিশেষ ছাপ পড়েনি।

"প্রথম উপাদান হল 'ডেডবডি।' দ্বিতীয় উপাদান সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা 'সাসপেক্ট'— যাঁরা খুন করতে পারেন। এঁদের কাছেই থাকে তিন নম্বর উপাদান। অজুহাত বা 'অ্যালিবাই।' খুনের সময় তাঁরা যে অন্য জায়গায় ছিলেন তার হাতে-গরম প্রমাণ। চতুর্থ উপাদান হল, কীভাবে খুনটি করা হয়েছে বা 'মোডাস অপারেন্ডাই।' পাঁচে আসে খুনের কারণ বা 'মোটিভ।' ছ'নম্বরে আসে 'ক্লু,' যা সংগ্রহ করে গোয়েন্দা বলবেন হত্যাকারী কে? সাতে আসছেন গোয়েন্দা এবং আটে খুনি। তা হলে ন' নম্বর উপাদানটা কী? সেটা হল 'রেড হেরিং' বা বুনোহাঁস। ভাল হুডানিটে এটা থাকে পাঠককে বোকা বানানোর জন্যে। বুনোহাঁসের পিছনে ছুটতে গিয়ে পাঠক বুঝতে পারেন না যে প্রকৃত খুনি চোখের সামনেই ছিল। তিনি দেখতে পাননি।"

'জ্ঞান না দিয়ে কাজের কথায় আসুন।' শ্বাপদের দৃষ্টিতে দীপশিখাকে মাপছেন পঞ্চাশ বছরের অনন্যা। দীর্ঘ তিন দশকে ধরে মাঠে-ময়দানে এবং বিধানসভায় রাজনীতি করে তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত ধারাল। 'আসছি ম্যাডাম।' দীপশিখা ল্যাপটপ চালু করেছে। মনিটরে দেখা যাচ্ছে আরামকেদারায় শায়িত পিডি-র ফোটো।

'প্রথম উপাদান, ডেডবডি।' বলল দীপশিখা, 'পঞ্চান্ন বছরের অবিবাহিত লেখক। অন্য পরিচয় --- নির্জনতা-প্রিয় লেখক। কারণ উনি কোনও অনুষ্ঠানে যান না। বুক লঞ্চের সময় সাক্ষাৎকার পর্যন্ত দেন না। অনেকে বলেন এটা মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি। আমরা সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে আসি দ্বিতীয় উপাদানে। অর্থাৎ সাসপেক্ট। যাঁরা সেই রাতে পুরী নিবাসে ছিলেন। অর্থাৎ মানসী দে, অনন্যা দে, লহরী সেন এবং বাদল মণ্ডল। সপ্তম উপাদান অর্থাৎ গোয়েন্দা হিসেবে আছি আমি আর বরুণ। আমি পিডি-র পোস্টমর্টেম করেছি, বরুণ তদন্ত করেছে। এবার তৃতীয় উপাদান অ্যালিবাই। গতকাল সবাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, পরশু রাত্তিরে কে কী করছিলেন? সবাই বলেছেন যে ঘুমোচ্ছিলেন। খুব স্বাভাবিক ঘটনা। কাজেই কারও কোনও অ্যালিবাই নেই।'

লহরী কড়া গলায় বললেন, 'একটা সুইসাইড নিয়ে এত নাটক কেন করছেন?'

লহরীর বয়স পঁয়তাল্লিশের আশেপাশে। পরনে জিন্স ও টিশার্ট, চাপা গায়ের রং, চোখে চশমা, হাবভাব উদ্ধত। হঠাৎ প্রচুর ক্ষমতা পেলে অনেক মানুষ মাথা ঠিক রাখতে পারেন না। লহরীর ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।

দীপশিখা ভাবলেশহীন মুখে বলল, 'আমাকে বলতে দিলে ভাল হয়।'

'আপনি নির্ভয়ে বলুন।' উৎসাহ দিলেন বাদল মণ্ডল। 'আমি আপনার পাশে আছি। পরের উপাদান কী?'

সত্তর বছরের বাদলকে দেখে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা জলহস্তি বলে মনে হয়। লহরী কড়া চোখে বাদলের দিকে তাকালেন। এই ঘর জুড়ে এখন তুমুল মানসিক টানাপড়েন চলছে। তার মধ্যে দীপশিখার মনে পড়ছে গতকাল সকাল সাড়ে আটটার সময় আসা বরুণের

তা হলে ন'নম্বর উপাদানটা কী? সেটা হল 'রেড হেরিং' বা বুনোহাঁস। ভাল হুডানিটে এটা থাকে পাঠককে বোকা বানানোর জন্যে। বুনোহাঁসের পিছনে ছুটতে গিয়ে পাঠক বুঝতে পারেন না যে প্রকৃত খুনি চোখের সামনেই ছিল

ফোনের কথা...

।।২।।

ভোর চারটের সময় পুলিশ কমিশনারের ফোন পেয়েছিল বরুণ। 'অনন্যা ম্যাম ফোন করেছিলেন। ওঁর দাদা, রাইটার প্রিয়ব্রত দেকে একটু আগে নিজের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। বালিগঞ্জ থানার সঙ্গে তুমিও কেসটা দেখো।'

লালবাজার থেকে জিপ চালিয়ে বালিগঞ্জ পৌঁছতে মিনিট কুড়ি লাগল। পুরী নিবাসের দোতলার শোওয়ার ঘরে ঢুকে বরুণ দেখল আরামকেদারায় আধশোওয়া হয়ে আছেন পিডি। নাক-মুখ থেকে গ্যাঁজলা বেরিয়ে পাঞ্জাবি নোংরা করে দিয়েছে। পাজামা আর চপ্পল ঠিকঠাক আছে। পাশের টেবিলে জলের গ্লাস আর ঘুমের ওষুধের চারটে পাতা রাখা। কোনও পাতায় ওষুধ নেই।

ফরেন্সিক টিমের ছেলেরা চলে এসেছে ঘুমচোখে। এরা অন্য কেসে এত তাড়াতাড়ি আসে না। অনন্যার ভয়ে এসেছে।

রাতে যাঁরা বাড়িতে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে একপ্রস্ত কথা বলে বেরোল বরুণ। বালিগঞ্জ থানা বডি পাঠিয়ে দিয়েছে বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে। থানার বড়বাবুর সঙ্গে বসে ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট লিখল বরুণ। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ জিপ চালাতে চালাতে দীপশিখাকে ফোন করল। সব শুনে সে বলল, 'কুড়ি মিনিটের মধ্যে আসছি।'

'আমি আপনার ডিপার্টমেন্টের সামনে।' জিপ দাঁড় করিয়ে ফোন কাটল বরুণ।

ইনকোয়েস্ট রিপোর্ট পড়েছে দীপশিখা। ডোম রাজুর হাত থেকে স্ক্যালপেল নিয়ে দীপশিখা জিজ্ঞাসা করল, 'বরুণ, একটা কথা বলুন তো! লহরী আর বাদল কেন পুরী নিবাসে রাতে ছিলেন?'

'মানসী দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে গতকাল সন্ধেবেলা জনা বিশেক অতিথি এসেছিলেন পুরী নিবাসে। নৈশভোজের পরে সবাই চলে গেলেও বাদল আর লহরী থেকে যান। দু'জনের থেকে যাওয়ার কারণ আলাদা। লহরী আর অনন্যা খুব ভাল বন্ধু। গণমোর্চায় অনন্যার ডানহাত হলেন লহরী। তাঁকে ছোট মেয়ে বলে মনে করেন মানসী। অন্যদিকে বাদল ছিলেন মানসীর মৃত স্বামী শুদ্ধব্রতর চেলা। শুদ্ধব্রত ১৯৭১ সালে যখন গণমোর্চা তৈরি করে সক্রিয় রাজনীতিতে আসেন, তখন বাদল ছিলেন তাঁর ডানহাত। বাদল আজ বিরোধী রাজনৈতিক দল জনশক্তির নেতা হলেও পারিবারিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে। উনি পুরী নিবাসের সব অনুষ্ঠানেই আসেন।'

স্ক্যালপেল দিয়ে কেটে আভ্যন্তরীণ অঙ্গ দেখার সময় দীপশিখা বলল, 'ইন্টারনাল অরগ্যানগুলো বড্ড ফ্যাকাশে! যাই হোক! ভিসেরা প্রিজার্ভ করছি কেমিকাল অ্যানালিসিসের জন্যে। রাজু, এবার মাথায় হাত দেব! চিজেল আর হ্যামার দে।'

খুলি ফাটিয়ে মস্তিষ্ক দেখা রুটিনের মধ্যে পড়ে। ছেনি-হাতুড়ি এগিয়ে রাজু বলল, 'ম্যাডাম, লাশের মাথায় সেলাইয়ের দাগ!'

'তাই?' মৃতদেহের চুলে হাত বুলিয়ে দীপশিখা দেখল মাথার পিছন দিকে লম্বা সেলাইয়ের দাগ রয়েছে। সে বলল 'পুরনো সার্জারির দাগ খুলে দেখি।'

খুলি উন্মুক্ত করে বেজায় অবাক দীপশিখা। মাথার পিছনের হাড় বা অক্সিপিটাল বোনের জায়গায় টাইটেনিয়াম ধাতুর তৈরি প্লেট বসানো। সে বলল, 'ভিক্টিমের মাথায় অপারেশান হয়েছিল! বরুণ, মেডিকেল হিস্ট্রি কী বলছে?'

'কিছু বলছে না ম্যাডাম।'

'স্ট্রেঞ্জ!' ভুরু কুঁচকে দীপশিখা বলে, "ফ্যাকাশে আভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মস্তিষ্কে সার্জারি। এই দু'টি ঘটনার ব্যাখ্যা না-পাওয়া পর্যন্ত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট লিখব না।'

'ম্যাডাম...'আমতা আমতা করে বরুণ, 'গণমোর্চা আর জনশক্তির ক্যাডাররা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বডি নেওয়ার জন্যে।'

'বডি দিয়ে দিন। কিন্তু ভিসেরা রিপোর্ট আসার আগে আমি পোস্টমর্টেম রিপোর্ট লিখব না। কোর্টে যখন বিরোধী পক্ষের উকিলবাবু আমাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করবেন, তখন ক্যাডাররা আমাকে বাঁচাতে আসবে? বরং চলুন, আমরা পুরী নিবাসে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলি।' কাজ শেষ করে বরুণের জিপের দিকে এগোল দীপশিখা।

পুরী নিবাস যাওয়ার সময় বরুণের কাছে পরপর ফোন আসছে। গণমোর্চার কাউন্সিলর আর এমএলএ-র ফোন পেয়ে বরুণ বলল, 'একটু সময় দিন স্যর।' জনশক্তির এক কাউন্সিলার ফোন করে বললেন, 'এক্ষুনি ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না দিলে আমরা রাস্তা অবরোধ করব।'

এই কথা শুনে মোবাইল অফ করে বরুণ বলল, 'আমরা এসে গেছি।'

পুরী নিবাসে ঢোকার পরে চারটি ঘণ্টা ধরে দীপশিখা সবার সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলল। বরুণ মোবাইল চালু করে গোপনে সবার কথা অডিও রেকর্ড করল। মানসী জানালেন ১৯৭১ সালে স্বামী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে কী ভাবে ওপার বাংলা এক বস্ত্রে কলকাতায় পালিয়ে এসেছিলেন। অনন্যা বললেন, গণমোর্চার তৈরির সময়ে শুদ্ধব্রত আর বাদলের উদয়াস্ত খাটনির কথা ও পরে বাদলের পাল্টি খাওয়ার কথা। বাদল বললেন অনন্যার হাতে পড়ে গণমোর্চা কী ভাবে নষ্ট হয়ে গেল এবং তিনি কেন জাতীয় দল জনশক্তিতে যোগ দিতে বাধ্য হলেন---সেই কথা। লহরী বললেন পিডি-র হুডানিটের প্রতি মুগ্ধতার কথা। কাজ চুকিয়ে পুরী নিবাস থেকে বেরিয়ে দু'জনে চলে গেল যে যার কর্মস্থলে। পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের পিয়ালিকে নিয়ে দীপশিখার কাছে বরুণ ফিরল সন্ধে সাতটায়।

দীপশিখা এর মধ্যে ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে ফোন করে জেনে গিয়েছে ভিসেরা রিপোর্টে কী আছে। সে বরুণকে বলল, 'যে ঘুমের ওষুধের খালি পাতা টেবিলে রাখা ছিল, সেই ওষুধটাই বেশি মাত্রায় পাওয়া গিয়েছে ভিক্টিমের শরীরে। ভিক্টিমের ভিসেরা কেন ফ্যাকাশে আর ব্রেন অপারেশানের কেন হয়েছিল— এই নিয়ে কেউ কিছু বলল না।'

দীপশিখার কথার মাঝে ল্যাপটপ খুলে পিয়ালি বলল, 'ম্যাডাম, একটা জিনিস দেখুন। গত কয়েক মাসে পিডি-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েকশো কোটি টাকা শেল কোম্পানি মারফত বিদেশি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গিয়েছে। সে সব ব্যাঙ্কের সন্ধান পাওয়া আমার সামর্থ্যের বাইরে।'

'কিচ্ছু বুঝলাম না।' কাঁচুমাচু মুখে বলল দীপশিখা।

'শেল কোম্পানি মানে কাগুজে কোম্পানি, বাস্তবে যেগুলোর কোনও অস্তিত্ব নেই,' বলল পিয়ালি। 'প্রথমে এইসব কোম্পানির অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করা হয়। নানা পথ ঘুরে সেই টাকা জমা হয় বিদেশি ব্যাঙ্কের

অ্যাকাউন্টে। তারপর শেল কোম্পানিগুলো উঠে যায়। অবৈধ ভাবে দেশের বাইরে টাকা পাচারের জন্যে এটা করা হয়।'

'কয়েকশো কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি যিনি করেছেন তিনি হঠাৎ সুইসাইড করলেন? ইন্টারেস্টিং!' বলল দীপশিখা।

'আচ্ছা পিয়ালি, ব্রেন সার্জারির রোগীদের কোনও ডেটাবেস আছে?'

'দেখতে হবে ম্যাডাম।'

'প্লিজ় দেখ। কলকাতা দিয়ে শুরু করো। না পেলে দিল্লি-বম্বে বা বিদেশ যাবে।'

রাত এগারোটার সময় কাজ শেষ করে হাসিমুখে দীপশিখা বলল, 'বরুণ, অনেকটা কাজ এগোল। আর একটু বাকি। তার জন্যে কাল সকাল ন'টার সময় আবার পুরী নিবাস চলুন। দেখা যাক নতুন কিছু জানা যায় কি না।'

।।৩।।

গতকাল বরুণের সেই ফোন আসার পর থেকে এখনও পর্যন্ত যা-যা ঘটেছে— সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দীপশিখা তাকাল বাদলের দিকে। বলল, "আপনি জিজ্ঞাসা করছেন পরের উপাদান কী? সেটা হল 'মোডাস অপারেন্ডাই।' ঘুমের ওষুধ বেশি মাত্রায় খেয়ে ভিক্টিমের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই লহরী বা অনন্যা দেবীর কথা মতো এটা আত্মহত্যা হতেই পারে। সেই জন্যেই জানার চেষ্টা করেছিলাম কারও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার বা খুন করার মোটিভ আছে কি না।"

'প্রিয়কে কেন কেউ খুন করতে যাবে?' গর্জে ওঠেন বাদল, 'সাতেপাঁচে থাকত না, বাড়ি থেকে বেরোত না, কারও সঙ্গে মিশত না...'

শান্ত গলায় দীপশিখা বলল, 'আমার এবং বরুণের অজস্র প্রশ্নের উত্তর আপনারা গতকাল দিয়েছেন। আপনাদের না-জানিয়ে সে সব কথার অডিও রেকর্ড করা হয়েছিল। কাজের কথাগুলো একে একে শোনা যাক।'

দীপশিখার ইশারায় ল্যাপটপে হাত দিয়ে বরুণ প্রথম অডিও ক্লিপ চালাল। দীপশিখা বলছে, 'মানসী দেবী, আপনার ছেলেকে কে খুন করেছে বলে মনে হয়?'

মানসী উত্তর দিলেন, "লহরী আমার ছেলের লেখার বিরাট বড় ফ্যান। নিজেও লেখে-টেখে। প্রিয়কে মেয়েটা গুরু বলে মানত। বারবার অনুরোধ করত ভাল লেখার টেকনিক শেখাতে। প্রিয় ওকে পাত্তা দিত না। একদিন খুব বাজে ব্যাপার হয়। প্রিয় নোংরা গালিগালাজ করে লহরীকে তাড়িয়ে দেয়। মেয়েটা বদমেজাজি। ও চাইলে সব পারে।'

লহরী বিস্মিত হয়ে মানসীর দিকে তাকালেন। মানসী লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিলেন। বরুণ পরের অডিও ক্লিপ চালিয়েছে। এবার অনন্যার কণ্ঠস্বর, "বাদলদা বারবার দাদাকে বলত জনশক্তিতে যোগ দেওয়ার জন্য। দাদা শুনত না। বাদলদা চেপে ধরায় একদিন বলেছিল, 'আপনার সব কুকীর্তির কথা জানি। আর একবার এই প্রস্তাব দিলে প্রেস কনফারেন্স করে দুনিয়াকে জানিয়ে দেব কোথা থেকে জনশক্তির ফান্ডে টাকা আসে।' দাদা বেঁচে থাকলে বাদলদার পলিটিকাল কেরিয়ার শেষ হয়ে যেত।"

বাদল আর অনন্যা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বুনো হাতির মতো ফুঁসছেন। বরুণ পরের অডিও ক্লিপ চালাল।

বাদলের গলার আওয়াজ। 'এটা অনন্যার কাজ। শুদ্ধব্রতদা ওপার বাংলা থেকে কলকাতায় এসে একটু থিতু হওয়ার পরে গণমোর্চা তৈরির পাশাপাশি পেট্রোল পাম্পের ডিলারশিপ নিয়েছিল। তেলের ব্যাবসায় কত টাকা আয় হতে পারে, আপনার আইডিয়া আছে? দাদা-বউদি খুব পুরী-ভক্ত। হাতে টাকা আসার পরে বাড়ি করে নাম দিলেন পুরী নিবাস। তেল ব্যাবসার টাকায় প্রতি ছ'মাসে একবার পুরী বেড়াতে যাওয়া হত। ওই টাকায় এই বাড়ির জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে মানুষ করেন দাদা-বউদি। শুদ্ধব্রতদা মারা যাওয়ার আগে উইল করে 'পুরী নিবাস' প্রিয়ব্রতর নামে করে গিয়েছিল। সেটা ঝাড়ার জন্যে অনন্যা এই কাণ্ড করেছে।"

বাদল আর অনন্যা এখনও পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। বরুণ চলে গিয়েছে পরের অডিও ক্লিপে। লহরী বলছেন, "মায়ের প্রতি অশালীন অবসেসন ছিল প্রিয়দার। প্রিয়দাকে লোকে জানে 'নির্জনতা-প্রিয় লেখক' হিসেবে। সেটা কেন জানেন? মায়ের প্রতি অবসেশান নিয়ে পাপবোধে ভুগত লোকটা। সমাজের চোখে চোখ রাখতে পারত না! মানসী মাসি কেন দিনের পর দিন এই জিনিস সহ্য করবেন বলুন তো? মাসি খুনটা করেছে এবং আমার এতে ফুল সাপোর্ট আছে।"

বরুণের অডিও ক্লিপ চালানো শেষ হতে দীপশিখা বলল, 'দেখা যাচ্ছে যে খুন করার মোটিভ সবার ছিল। কেউ নিজের মোটিভ বলেননি। তবে অন্যের মোটিভ

বলে দিয়েছেন। সেটাই স্বাভাবিক! এবার আসা যাক ছ'নম্বর উপাদান 'ক্লু'য়ের প্রসঙ্গে। প্রাথমিক ভাবে আমাদের হাতে একটিই সূত্র ছিল। ভিক্টিমের খুলিতে পুরনো সার্জারির দাগ এবং ফ্যাকাশে ইন্টারনাল অরগান। এইসব নিয়ে প্রশ্ন করায় বাদলবাবু, লহরী দেবী এবং মানসী দেবী বলেছেন যে তাঁরা কিছু জানেন না। অনন্যা দেবী বলেছেন, 'দাদা কয়েকবার বিদেশে গিয়েছিল। তখন কিছু হয়ে থাকতে পারে। আমি জানি না।' আমরা তখন সারা ভারতের ব্রেন সার্জারির রোগীদের ডেটাবেস চেক করলাম। এবং দেখলাম যে মুম্বইয়ের ক্যানসার হাসপাতালে পাঁচ মাস আগে শুভব্রত দে নামে পঞ্চান্ন বছরের এক ব্যক্তির ব্রেন সার্জারি হয়েছিল। রোগটি হল মস্তিষ্কের ক্যানসার। অপারেশানের নাম 'ক্রেনিওটমি ও ক্রেনিওপ্লাস্টি।' এর পরে আমাদের কাজ সহজ হয়ে যায়।"

'কী ভাবে?' ফ্যাকাশে মুখে প্রশ্ন করলেন বাদল।

'কারণ আমরা এখন শুভব্রতর বাবা-মায়ের নাম, বাড়ির ঠিকানা— সব জানি। এও জানি যে ওঁর ইন্টারনাল অর্গান ফ্যাকাশে হওয়ার কারণ কেমোথেরাপি। ঘুমের বড়ি বা কোনও বিষ খেয়ে মারা গেলে ইনটার্নাল অর্গান লালচে থাকে। আমাদের পরিভাষায়, 'কনজেস্টেড।' এই ভিক্টিমের ক্ষেত্রে সেটি ছিল পেল।'"

'চুপ! একদম চুপ!' উত্তেজিত বাদল উঠে দাঁড়িয়েছেন। চিৎকার করে বলছেন, 'অনন্যা, তুই কেসটা ক্লোজ় করতে বল। আর এই ইডিয়েট দুটোকে এক্ষুনি ট্রান্সফার কর জঙ্গলমহলে!'

'গণমোর্চার ক্ষতি হলে তো জনশক্তির লাভ, বাদলবাবু,' বলল দীপশিখা, 'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি বরং আপনাকে আরও একটা সূত্রের কথা বলি। দীপশিখার ইশারায় বরুণ আবার অডিও ক্লিপ চালাল।বাদল বলছেন, 'হাতে টাকা আসার পরে বাড়ি করে নাম দিলেন পুরী নিবাস। তেল ব্যাবসার টাকায় প্রতি ছ'মাসে একবার পুরী বেড়াতে যাওয়া হত। ওই টাকায় এই বাড়ির জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে মানুষ করেন দাদা-বউদি।"

বাদলের দিকে তাকিয়ে দীপশিখা বলল, 'স্ক্রিপ্টের বাইরের কথা বলেছেন বলেই আমার মনে প্রশ্ন জাগল। এই বাড়ির, অর্থাৎ পুরী নিবাসের জগন্নাথ আর সুভদ্রা না হয় প্রিয়ব্রত আর অনন্যা। বলরাম কোথায়?'

মানসী হঠাৎ কেঁপে উঠলেন।

।।৪।।

'উত্তরটা আমিই দিই।' বলল দীপশিখা। "শুদ্ধব্রত এবং মানসীর তিন সন্তানের নাম প্রিয়ব্রত, শুভব্রত এবং অনন্যা। মুম্বইয়ের হাসপাতালের রেকর্ড বলছে যে প্রিয়ব্রত আর শুভব্রত যমজ এবং এক রকম দেখতে। অনন্যা ওঁদের থেকে পাঁচ বছরের ছোট। শুভব্রতর একটি জিনবাহিত রোগ ছিল। নাম 'ডাউন্স সিনড্রোম।' এক রকম দেখতে যমজের মধ্যে একজনের ডাউন্স সিনড্রোম আছে ও অন্যজন সুস্থ— এটা খুব দুর্লভ ঘটনা, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। জড়ভরত শুভব্রত কোনও দিন বাড়ি থেকে বেরোননি, লেখাপড়াও শেখেননি। ভাইয়ের দেখাশোনা করবেন বলেই প্রিয়ও বাড়ি থেকে বিশেষ বেরতেন না। ভাইয়ের প্রতি ভালবাসাই ওঁকে নির্জনতা-প্রিয় করে তোলে। এটা লেখকের ব্র্যান্ডিং বা মার্কেটিং গিমিক নয়। শুভব্রত জীবনে প্রথমবার বাড়ি থেকে বেরোন মাত্র কিছুদিন আগে। ওঁর মাসখানেক ধরে খিঁচুনি বা কনভালশান হচ্ছিল। সেটার চিকিৎসা করাতে মুম্বইয়ের হাসপাতালে গেলে মস্তিষ্কের ক্যানসার ধরা পড়ে। ওখানেই অপারেশান হয় ও কেমোথেরাপি চলে। চিকিৎসক জানিয়ে দেন আয়ু বড়জোর ছ' মাস।'

অনন্যা অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাচ্ছেন। বাদলের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইছেন।

আর এক ঢোঁক জল খেয়ে দীপশিখা বলল, 'এত কিছু জানার পরে আমি আর বরুণ বুঝতে পারলাম যে পিডি বর্ণিত হুডানিটের উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম উপাদানটিতেই ধোঁকা ছিল। অর্থাৎ ডেডবডি! ওটা আদৌ পিডি-র নয়। ওটা শুভব্রতর, যাঁকে কেউ চেনে না। এইখানে এসে কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের জোগাড় করা তথ্য আমাদের কাজে লাগল। আমরা জানলাম যে পিডি-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েকশো কোটি টাকা ওভারসিজ় অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছে।'

অনন্যা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'জাস্ট শাট আপ!'

'তা হলে আমি বলি?' দীপশিখার দিকে তাকাল বরুণ। দীপশিখা বসে পড়ল।

'জেরা করা আমার পেশা।' আঙুলের ইশারায় অনন্যাকে বসতে বলল বরুণ। 'কাকে কী প্রশ্ন করতে হয়, সেটা ভালই জানি। তাই আজ সকাল ন'টার সময় পুরী

নিবাসে ঢুকেছি। দীপশিখা ম্যাডাম যখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন আমি টানা তিন ঘণ্টা গল্প করেছি মানসী দেবীর সঙ্গে। রবি ঠাকুর লিখেছিলেন, 'আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ।' মানসী দেবীরও সেই অবস্থা। ওঁর অনেক কথা বলার ছিল। আমার কাজ ছিল ঠিকঠাক প্রশ্নগুলো করা। কি মানসী দেবী, তাই তো?"

অনন্যা হিসহিস করে বললেন, 'মা, তুমি কী বলেছ?'

বাদল ভাঙা গলায় বললেন, 'বউদি! তুমি কী বেফাঁস বকেছ?'

দু'হাত নেড়ে মানসী বললেন, 'তোরা ঘাবড়াচ্ছিস কেন? বরুণ ভাল ছেলে। ওকে আমি বলেছি যে শুভকে কেউ খুন করেনি। লহরী ঘুমের ওষুধ এনে দিয়েছিল। আমি শুভর হাতে ওষুধ তুলে দিই। ও নিজেই সেগুলো খেয়েছে। এ তো পরিষ্কার আত্মহত্যা। ছেলেটা ক্যানসারের যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। সে জিনিস চোখে দেখা যায় না। আমি তো দিনরাত ঠাকুরকে বলতাম ওকে তুমি তুলে নাও।'

মেনে নিলাম যে এটা আত্মহত্যা। কিন্তু প্রিয়ব্রত মারা গিয়েছে বলে যে নাটকটা সবাই মিলে করলেন, তার ব্যাখ্যা কী?' প্রশ্ন করল বরুণ।

'আজকাল ভোটের আগে কী সব সমীক্ষা-ফমিক্ষা হয়। সেটায় জানাচ্ছে যে পরের ভোটে আমাদের পার্টি হারছে। পাওয়ারে আসছে জনশক্তি। ওরা একবার এলে আমার ছেলেমেয়ে দু'টোর জেলে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

'পিডি কেন জেলে যাবেন? উনি তো রাজনীতি করতেন না!'

'ও জেলে যাবেই! কারণ অনন্যার সব টাকা প্রিয়র অ্যাকাউন্টে জমা হত। প্রিয় তো লেখক মানুষ। ব্রেন খুব ভাল চলে! প্ল্যানটা ওর মাথাতেই আসে। প্রিয়র লেখা অনেক লোকে পড়লেও ওকে কেউ সেভাবে দেখেনি। শুভকে তো আমরা এই ক'জন ছাড়া কেউ চেনেই না।'

'বাদলবাবু তো বিরোধী পার্টি!' বলল বরুণ।

'ধুস! ও যতই অন্য পার্টি করুক না কেন, আমাদের পরিবারের সদস্য ছিল, আছে, থাকবে। বাদলই কাকে সব বলে-টলে প্রিয়র টাকাগুলো বিলেতে পাঠাল। ও-ই প্রিয়র জন্যে বেনামি পাসপোর্ট, ভিসা... আরও কী সব কাগজপত্তর জোগাড় করে দিল। এরপর প্রিয়র প্ল্যানমাফিক সবাই একজোট হলাম আমার জন্মদিনে। রাত্তিরে শুভকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া হল। প্রিয় ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল এয়ারপোর্ট। নতুন পরিচয়ে, নতুন দেশে বাঁচতে। কিছুদিন পরে অনন্যা আর লহরীও সেখানে চলে যাবে। বাদল সেই ব্যবস্থাও করছে। পড়ে রইলাম আমি আর বাদল। আমি কোথাও যাব না। আর বাদল তো এখানেই থাকবে। ওর পার্টিই তো ক্ষমতায় আসছে।' দম নিয়ে মানসী বললেন, 'পরিবারের মাথা হিসেবে এর থেকে ভাল সমাধান আমি দেখতে পাইনি।'

' মা, তুমি কি পাগল?' অনন্যা কপাল চাপড়াচ্ছেন, 'এতবার করে শেখানো হল, যা বলতে বলা হয়েছে, তার বাইরে একটাও কথা বলবে না। আর তুমি এই করলে?'

' বরুণের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।' মানসী অভয় দিলেন, 'ও বলেছে যে সব স্বীকার করলে শুধু আমার জেল হবে। তোদের কিছু হবে না।'

অনন্যার দিকে তাকিয়ে বরুণ বলল, "শুভব্রতকে খুন করা হয়েছে। কাজটা করেছেন লহরী আর মানসী দেবী। খুনের ষড়যন্ত্রে সামিল আপনি, পিডি এবং বাদল বাবু। তদন্তে অসহযোগিতা, রাজনৈতিক চাপের মাধ্যমে তদন্তে বাধাদান—আপনাদের বিরুদ্ধের ন্যায়-সংহিতার অনেকগুলো ধারা লাগু হবে। নিখোঁজ প্রিয়ব্রতর বিরুদ্ধে, এ ছাড়াও লাগু হবে আর্থিক দুর্নীতি, দেশ ছেড়ে পালানো, অন্য পরিচয়ে বাঁচা। সেই তদন্তের জন্যে ইডি আর সিবিআই আছে।'

দীপশিখা এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সবার দিকে তাকিয়ে সে বলছে, 'পিডি-র বলা হুডানিটের ন' নম্বর উপাদান, রেড হেরিং কোথায় গেল? সেটাও আছে। আপনারা সবাই মিলে আত্মহত্যার যে গপ্পোটা বানিয়েছেন, সেইটা হল বুনোহাঁস। গণমোর্চা আর জনশক্তি-র লোকেরা নিজেদের মধ্যে সেটিং করে যে চমৎকার 'ফল্স ন্যারেটিভ' বানিয়েছেন তার পিছনে আমি আর বরুণ কাল থেকে ছুটলাম। যেভাবে সারা পৃথিবী ছুটছে মিথ্যে আখ্যানের পিছনে।'

তথ্যসূত্রঃ

https://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-twins-down-syndrome-genetics-20140416-story.html

EST 2022

HIMALAYAN MAGIC MASALA

SENCO
GOLD & DIAMONDS

CALCUTTA
CHAAT
& Bakery

একটি গ্রে-সেক্সুয়াল মেয়ের সঙ্গে

সুবোধ সরকার

সে বলেছিল, 'দুপুরবেলা ভাললাগে না
ল্যাপটপের স্ক্রিনে আমার
চোখের জল পড়ে'।

সে বলেছিল, 'রাতে যখন বৃষ্টি নামে
ভাললাগে না, লিভ-ইন করি
কুড়িতলার ঘরে'।

'লিভ-ইন'করি, 'লিভ-ইন'করি,'লিভ-ইন'
কি করে আমি হলাম এত তৃষ্ণাহীন?
ইচ্ছা নেই ইচ্ছা নেই, হয়না কোনও ইচ্ছে
সেই তো পড়ায় কাফকা, আরে সেই তো পড়ায় নিৎসে।

সে বলেছিল , 'আমার বুকে বৃষ্টি নেই
তমাল গাছে দৃষ্টি নেই
চোখ থেমে যায় কম্পিউটার স্ক্রিনে'।

ও ভালবাসা ফেরৎ এসো বসন্তের দিনে
চরমে উঠে চূড়ান্তের
চাইছি উত্থান।

সে বলেছিল, 'আমরা দেবী নেমেসিসের
যদিও সন্তান
যৌনতাহীন যন্ত্রণাহীন গাইছি এক-ই গান'।

আমরা হলাম মধ্যরাতের গ্রে-সেক্সুয়াল দল
লিভইন করি, ভালবাসিনা, নেই সে মনোবল।

তারপর

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

পর্ব - ১

পাল ছিঁড়ে মাস্তুল ভেঙে পড়েছে
আমার আর রোদ্দুরে বেরোনো হয় না
সারাদিন মাথা গুঁজে আমি হিসেব মেলাই
কত শ্যাওলা, পেরেক আর মচমচে হয়ে যাওয়া কাঠ
জমল জীবনে!
আর আমার ঘুম পায়। ভোট দিতে ইচ্ছে করে না।

তুমি আমায় কটু কথা বলে সেই যে চলে গেলে
তারপর থেকে আর কবিতা লিখতে সাধ হয় না আমার
ভাবি, চারটে শালিখের দামে বিক্রি করে দেবো নৌকা
তারপর...

কী জানি তারপর কী!

পর্ব - ২

ঘুমের অতলে পাথর বাঁধা আছে
সে আমাকে ভেসে উঠতে দেয় না

করাত কলের শব্দ পাই শুধু, আর
মনে পড়ে আজ ধোসাওলা যাবে পাড়া দিয়ে

পৃথিবীর হাই ওঠে আর তার জিভের ওপর
শহর পেতে আমরা বসে পড়ি

বড্ড আলো চারিদিকে, ঘনশ্যাম দরকার এখন
মনে হয় আমিও ধোসার গাড়ি নিয়ে বেরোবো পাড়ায়

ঘুমের পাথর খুলে তুমি বলো দাঁড়াবে না আঙ্গিনায় আর?
ওঠাবে না দুয়ারের পাখি? বলো পাখি

একটি মেয়ের কাহিনী

মঞ্জুশ্রী সেন

ছোট্ট মেয়ে জন্মেছিল
মাটির কুঁড়ে ঘরে।
বাপ মার সাথে বড় হল
বছর কুড়ি ধরে।

বাপমা তার বিয়ে দিল
ভালো ছেলে দেখে।
স্বামী তার ভালো ছিল,
করতো ভালো উপার্জন।
কিন্তু মা ছিল তার ভীষণ রাগী,
ভীষণ কঠিন মন।
একটি মাত্র ছেলে ওনার
প্রাণের প্রিয় ধন॥

বিয়ের পরে ছেলেকি তবে
বৌকে দেবে মন?
ভেবে তো মা রেগে আগুন,
ভাবেন সারাক্ষণ।

কিন্তু সেসব হয়না কিছু
ছেলে-বৌএর মাঝে।
রাগের প্রকাশ দেখল সবাই
বৌ-শ্বাশুড়ির মাঝে॥

মেয়ের মায়ের মন মানে না—
কেমন আছে মেয়ে?
এই ভেবেই তো গেলেন তিনি
মেয়ের বাড়িতে।
সকল সময় শ্বাশুড়ি তাকে
রখেন পাহারাতে॥

মা শুধায়—"কেমন আছিস মা?"
মেয়ে বলেনা কিছু মাকে-
শুধু তাকায় করুন চোখে।
বলেন মা শ্বাশুড়িকে—
"মেয়ে আমার শান্ত,
বলেনা কিছু মুখে।"

মেয়ে তখন সাহস ক'রে
বলে তার মাকে—
"মাগো, বড় সুখে আছি,
ঝিঙের ফুল ফুটলে ভোজনে বসি।"
এই বলে সে মায়ের কোলে
মুখ লুকিয়ে কাঁদে।
হেঁয়ালি কথা বোঝেনা কেউ,
শ্বাশুড়িও না মোটে।

সারা দিনের পরে বিকেলবেলা ঝিঙের ফুল ফোটে।
সাঁঝের বেলা মেয়ের আমার
খাবারটুকু জোটে।

মায়ের মন কাতর হলেও
করার কিছু নাই।
স্বামী ভালোবাসে শুনেই
মনটা ভরে যায়।

এমন সব হয়তো শুধু
মেয়েদেরই তরে,
ছেলেরা তো কেউ যায় না,
মাগো, পরের ঘরে।

মেয়েরাই তো মা-মায়ের জাত,
সন্তান করে ধারণ।
হাসি মুখে হৃদয় মেলে
পরকে করে আপন।।

মা, বাবা ও অভাগিনী

অরুণাশিস সোম

প্রেমের আগুন জানান দিতেই ঝড় নেমেছে গাছে,
মেয়ের কথার দাম ছিল না মা ও বাবার কাছে!

মা বোঝেনি প্রেমিক কবি ব্লগ বানাল লেখার,
ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ পেলে কেউ হতনা বেকার!

বাবার তুমুল চোখ রাঙানি, ঘা লেগেছে আঁতে,
অহংকারে মন দিল না মেয়ের শুশ্রূষাতে!

মেয়ের স্পষ্ট হুমকি ছিল, পালিয়ে যাবে দূরে,
কিন্তু শেষে সাহস ফুরোয় একলা হৃদয় খুঁড়ে!

তুফান এলে কেবা এখন মাপছে গতি হাওয়ার?
রাস্তা বহু নিরুদ্দেশের, একটা খুঁজে পাওয়ার!

গভীর রাতে স্বপ্ন পারদ, পিছলে গেছে সুখে-
কম বয়েসী বাধ্য মেয়ের প্রেম ভেঙেছে বুকে!

দুঃখ জমে পাথর হতেই ভিড় বেড়েছে কত,
বাবার প্রিয় জামাই আসে, মায়ের "ছেলের মত"!

মায়ের সুরে মেঘ ডেকেছে, হিসেব শুরু ক্ষয়ের,
মিথ্যে হাসির মধ্যে কিছু সত্যি অভিনয়ের!

মিথ্যে

অরুণাশিস সোম

তোমার তরে মিথ্যে বলার পর,
আমায় তুমি খারাপ ভাবো আজ,
ভাঙবে এমন যত্নে রাখা ঘর?
আকাশ জানে মেঘের কারুকাজ!

সত্যি কেবল ভাঙতে পারে মন,
মিথ্যে তবু জাগায় আশার গান,
এই যে এত খুশির আয়োজন,
সমস্ত সেই মিথ্যেটুকুর দান!

বৃষ্টি হলে শুষ্ক থাকাই ঢের,
কে আর রোখে জলের গতিবেগ?
এমন কোনো সন্ধে হলেফের,
আমার চোখে ঢাকতে তোমার মেঘ?

মিথ্যে কথায় কষ্টিপাথর জোর,
মানুষ ভাবে খুব নিরীহ চোখ,
যে সব রাতের হয় না কোনো ভোর,
তাদের বুকে সবার ভালো হোক!

বৃষ্টিভেজা নৌকো হারায় পাল,
সত্যি আবার সিক্ত করুক ত্বক,
মিথ্যে শেষে বুঝিয়ে দেবে কাল,
প্রেম ও ঘৃণা উভয় সমার্থক!

সময় শুধু বৃষ্টি এনেদিক,
আমায় তুমি আবার দিও ফুল,
হয়ত আমি সবার কাছে ঠিক,
কেবল জানি তোমার কাছে ভুল!

সুন্দরী নায়াগ্রা

নিরঞ্জন রায়

দেখিতে ছিল মোর বড়ই সাধ,
সুন্দরী নায়াগ্রা জলপ্রপাত।

অবশেষে পূর্ণ হলো সেই অভিলাষ,
জুলাই শেষে হ'ল চোখে দেখা আশ।

নায়াগ্রার জলরাশি গম্ভীর গর্জন,
যেন বাঁধভাঙা স্রোতে দৃষ্টি-নন্দন।

ভাষায় সে দৃশ্য হয়না বর্ণন,
অপরূপ রূপে মুগ্ধ প্রাণ মন।

পঙ্গু গায়ে নদীবক্ষে নৌকা ভ্রমণ,
শুভ্র জলরাশিতে স্নান সমাপন।

এমন আনন্দ কভু পাইনি জীবনে,
আজীবন এ দেখা থাকিবে স্মরণে।

বোটে চড়ে ওয়ার্লপুল বড়ই রোমাঞ্চকর,
এইপারে আমেরিকা, কানাডা ওইপার।

শুনেছি অশ্বখুরাকৃতি নায়াগ্রা বড়ই মনোরম,
কানাডা না গেলে হবেনা দৃষ্টিনন্দন।

যেই কথা সেই কাজ, কানাডার ওন্টারিও গিয়ে -
প্রত্যক্ষ করলাম হেরিয়া নয়নে।

কী যে অপরূপ শোভা, ভাষায় না যায় বর্ণন,
লাস্যময়ী নায়াগ্রার অপার গর্জন।

যতদেখি তত ভাবি-
ঈশ্বরের সৃষ্টির কতই না আকর্ষণ,
তার আশীষ না হলে-
হতো না লাস্যময়ী নায়াগ্রা দর্শন।।

লম্বা

বসুন্ধরা মিত্র

লম্বা হতে সবাই চায়,
যাতে নীল আকাশের আশীষ পায়,
যাতে গণ্য মাপের মানুষগুলো গুণের গীতি গায়,
যাতে ভিড়ের মাঝে উঁচিয়ে থাকে
নিজের পরিচয়।
তবে লম্বা হওয়ার অনেক দায় -
শিরদাঁড়া ঋজু রাখা সহজ নয়,
সেই সঙ্গে মেরুদন্ডে নমনীয়তাও স্পর্শ চায়,
যাতে নীচের পানে দৃষ্টি যায়,
মাটির কাছের রামধনুতে পানা ঠেকে যায়,
উচ্চতা হীন তৃণ সাগরে মন মিশিয়ে
আর্দ্র হয় হৃদয়,
মাটি থেকে দুর্বো তুলে যে শিরোপরে স্থান দেয়
সেই কি প্রকৃত লম্বা হয়?

COMMUNITY CULTURE CHARITY
প্রবাসী
Desi Bazar Desi Kitchen
FOOD BOOTH @ PRABASI DURGA PUJA OCT 11-13
DB DK
SILVER SPONSOR
DESI BAZAR
DESI KITCHEN
(669) 214-5550
712 S Wolfe Rd, Sunnyvale, CA 94086
DESIBAZARDESIKITCHEN.COM

বঙ্গজ
BONGO'S
AUTHENTIC BENGALI CUISINE

The Eden Gardens
SHUBHO
Durga Puja
Come celebrate with us, share a meal, and soak in the festive spirit.
2 N FIRST ST UNIT 150, SAN JOSE
+1 (408) 320-2471

জয় জয় মা দুর্গা

বিশ্বনাথ বসু

আমার যে কী হবে---এখন এই কথাটা নিজেই নিজের ক্ষেত্রে বলি। আগে এই কথার অ্যাঙ্গেলগুলো একটু অন্যরকম ছিল।

মা বলত, এই রকম আলাভুলো মন নিয়ে, আমার কী হবে!

বাবা বলত, এই দামড়া, আবোধ ছেলের ভবিষ্যত যে কী!

শিক্ষক বলতেন, এই বুদ্ধি আর থলথলে শরীর নিয়ে কী যে করবি!

প্রথমেই নেগেটিভ দিয়ে শুরু করলাম এই কারণে, লেখার ফরমায়েশ এসেছে এক সরস মানুষের কাছ থেকে। যদিও সাক্ষাতে আস্ত নিংড়ানো পাতিলেবুর মতো চেহারা, তবুও রম্যরচনা বলে কথা। কাতুকুতুও দিয়ে আবার, লেখক নিজে নিজেই মজা পাওয়ার মতো পাকা নয় --- এমন একটা পজিশন থেকে বিষয়টিকে কিক মেরে, দর্শক মনের বাষট্টি রকমের সমস্যায় ভরা মাঠে ছড়িয়ে (বাকি দু' রকমের ভালোলাগা এখনো পড়ে আছে) তার একটিতে নিক্ষেপ করতে হবে। বাকি একটি না হয় পেটরোগা, রাজনৈতিক টানাপড়েনময় AI ছোঁবো কি ছোঁব না মোবাইল স্ক্রিন, না অফ স্ক্রিনে চেখে দেখানোর জন্য থাক।

আদিযুগের বদ্যিবুড়োর মতো আমায় আজও পেন খাতা আর মাথা চুলকিয়ে তবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপহারের শব্দমালা বেরিয়ে আসে। সেই শব্দমালা দিয়ে সমসাময়িক সময়কে ধরব বলে ঠিক করলাম! কিন্তু স্মৃতির সরণি ধরে কোথায় যে চলেছি। আজও তার থেকে মুক্ত হতে পারলাম কই। জামায়, জুতোয়, বলনে-চলনে, নাওয়ায় খাওয়ায় যে কে সেই।

পূর্ণ অনুষ্ঠানে ধুতি-পাঞ্জাবি, সেমি অনুষ্ঠানে পাজামা-পাঞ্জাবি আর নিত্যদিনে হাফশার্ট-প্যান্ট। পূর্ণ অনুষ্ঠান বলতে পুজোবাড়ি, বিয়েবাড়ি। সেমি অনুষ্ঠান জন্মদিন, ফ্যামিলি গেট টুগেদার। বলনে বাংলা ভাষা, সেখানে ইংরেজি awsome নেই বললেই চলে। কিংবা হঠাৎ গায়ে চিমটি পড়লে আজও অসংসদীয় ভাষা বেরোয়, 'আউচ' বেরোয় না। যতই হিল্লি দিল্লি লন্ডন ইতালি যাই না কেন, বাড়ি ফিরে কড়াইয়ের ডাল আর পোস্তর জন্য কনভালসান হবেই হবে। দেখেছেন, বাঙালি স্বভাবের আর একটা দিক কেমন আছে --- সুযোগ পেলেই বিদেশ ভ্রমণের কথাখানা পেরে ফেলি।

সেই সূত্র ধরে বলি, আজকের বলা কথাখানা আজকের নয়। ১৯৯২ সালের এক সন্ধেবেলার ঘটনা হলেও সূত্রপাত হয়েছিল দিন দুই আগে। আমার তখন আড়বালিয়ায় বাস, মানে আমার গ্রামের বাড়িতে। '৯২ সালে আমি ক্লাস এইটে পড়ি। হালকা পাখা গজিয়েছে মানে আজকের হিসাবে ভাবলে তা তেমন কিছু নয়। পাখার জোর আর তোর যদি অধিক হয়, ছেঁটে দেওয়ার জন্য বাবা জ্যাঠা স্কুলের টিচাররা কাঁচি শান দিয়ে বসে আছেন। বাড়িতে আমাদের পরিবার ছাড়া তিনঘর ভাড়াটে, তারমধ্যে ছোটমার পরিবারকে আমি বা আমরা ভাড়াটে ভাবতে পারিনি।

তবে বাকি দু'ঘর ভাড়াটের মধ্যে একজন গানের দিদিমণি ও তাঁর তবলাবাদক স্বামী। অন্যঘরে গার্লস স্কুলের দিদিমণি ও তার স্বামী, যিনি তবলা শিখছেন। স্কুলের দিদিমণিও গান করতেন। এক ঘর থেকে লোকগীতি ভেসে আসছে তো অন্য ঘর থেকে 'সাতভাই চম্পা জাগরে' আহ্বানের মধ্যে পড়ে বাড়ির সকলের ভালোলাগা থেকে ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। কারণ বয়সে কাঁচা হলেও বুঝতে অসুবিধে হত না, একটা কোথায় 'এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায় দ্যাখ' শুরু হয়ে যেত।

দুই ঘরে সদ্য বিবাহিত আর অল্পসদ্য বিবাহিতদের কোনো সন্তানাদি ছিল না। গার্লস স্কুলের দিদিমণি যিনি মূলত লতাজির গান করতেন তাঁর সন্তান আসার সময় হয়েছে কিন্তু কোথায় যেন একটু দেরি হচ্ছে। একথা সেই সময় মা কাকি কিংবা দিদিমণির শ্বশুর শাশুড়ির আনাচে কানাচে হওয়া আলোচনায় শুনেছি। যদিও এসব আলোচনা লকরুমে ব্যালট বক্স রাখার মতো গোপনীয়তায় করা হত। আর আমরা থাকতাম তার থেকে শতহস্ত দূরে। আনাচে কানাচে থেকে কিছু শুনে মনের প্রশ্নের খোরাক মেটানোর কোনো সুযোগ ছিল না। তোমাদের ইউটিউব তো তখন ধরাধামে আসেনি। একখানা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি, চ্যানেল মাত্র একখানা---ডিডি বাংলা। আর ছাদে অ্যান্টেনা ঘোরালে বাংলাদেশ টিভি ধরা দিতে পারে।

> এক ঘর থেকে লোকগীতি ভেসে আসছে তো অন্য ঘর থেকে 'সাতভাই চম্পা জাগরে' আহ্বানের মধ্যে পড়ে বাড়ির সকলের ভালোলাগা থেকে ধৈর্যচ্যুতি ঘটত।

আমাদের কানে ধরা দিল মানে যাদের জানার কোনো অধিকার নেই, শোনার অধিকার নেই, সেই অনূর্ধ্ব ছেলেছোকরা কুলের দিদিমণি যে মা হতে চলেছেন। 'কী আনন্দ কী আনন্দ দিবারাত্রি' --- ধরে নিয়ে বেড়াতে লাগল আমাদের বাড়ি জুড়ে। আসলে সে সময়েও পড়শি পড়শির জীবনে অবাধ যাতায়াত ছিল। অনেক দিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। মাস্টারমশাই (দিদিমণির স্বামী) ও দিদিমণির আসন্ন সন্তানের খবর পেয়ে দিদিমণির শ্বশুরবাড়ি ও বাপেরবাড়ির লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়া মানুষেরা আস্তে আস্তে 'ভাল থাকিস, সাবধানে চলিস' বলতে বলতে পালিয়ে গেল। রয়ে গেলেন মাস্টারমশাইয়ের এক পাড়াতুতো পিসি।

পিসির উচ্চতা বাড়ির আর সকলের চেয়ে

কিঞ্চিৎ বেশি। স্বাস্থ্য - সোমত্ত দু'খানা পুরুষকে জাপটে ধরলে, নড়া তো দূরের কথা, হাতের চাপে বড়াও ভাজতে পারেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। গলার স্বর - গ্রাহাম বেল শুনলে বলতেন --- টেলিফোনের প্রয়োজনীয়তা সবার কাছে নয়।

ছোটমা আমার মায়ের থেকে বুদ্ধিতে বেশি। সেই বুদ্ধির বলে তাই কিঞ্চিৎ ঘাট থেকে খবর জোগাড় করল, আর কিছুটা সাপ্লাই দিল আমাদের পরিচারিকা ফুলিদি। পিসির নাম কি? পিসি ছাড়া সেটা কেউ বের করে আনতে পারল না। পিসি সব পারে, মাঠে ধান পাট সবজির কাজ জানে, পোঁতা থেকে তোলা, ঝাড়াই মাড়াই সকল কাজ। গাঁ-গঞ্জে ধানসিদ্ধ করা বা ধান ঝাড়াই করা মানুষদের শক্ত-পোক্ত ধরা হয়। পঞ্চাশ-একশো জনের রান্নাও কোনো ব্যাপার না। কোটা ধোয়া চাপানো নামানো তার নিত্যদিনের কাজ। সন্তানসম্ভবা মায়ের দেখভাল থেকে পৃথিবীর আলো দেখানো, পিসির কাছে অন্ধকারে টর্চের আলো দেখানোর মতো সহজ। তিনচাকা ভ্যান চালাতে জানে। শুধু তাই নয়, ভ্যান চালিয়ে একবার এক রোগিকে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। সেই পিসি যখন জানালো যাত্রাদলেও সে বছর দুয়েক কাজ করেছে গান নাচ সহকারে, ব্যাস রাতে পিসিকে নিয়ে আমরা যাব ঠিক হল। মধ্যিখানে দেয়ালে পিঠ দিয়ে পিসি, আমরা চারদিক দিয়ে পিসিকে ঘিরে। যে দিদিমণিকে দেখভাল করতে এসেছিল পিসি, সেও পিসির মুখের দিকে তাকিয়ে। দিদিমণির স্বামী মাস্টারমশাই শুধু বলে উঠলেন --- 'হ্যাঁ গো পিসি, তুমি তো বাড়িতে অমিতাভ বচ্চন হয়ে গেলে।'

সভা শুরু হতেই পিসি কৃষ্ণের নাম দিয়ে গান গাওয়া শুরু করল। উরে বাবা, কী রেঞ্জ! হালকা থেকে গান সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল। গানের কথা ভাষা সব আমাদের অজানা হলেও পিসির অভিব্যক্তিতে গমগম করছে। আমরা মুগ্ধ এই ভেবে, দ্যাখ কী দক্ষতা খেটে খাওয়া পিসির। কীর্তন, ভাটিয়ালি, মাঝির গান, ধানঝাড়াইয়ের গান, ছাদপেটানোর গান যখন সপ্তমে, তখন আমার বাবার আবির্ভাব। মানে আমার অবস্থা হাজার হাজার মানুষে ভরা সার্কাসের প্যান্ডেলে লাইট অফ হয়ে যাওয়ার মতো। পিসির সব অভিব্যক্তি নানারকম চললেও আমার মুখে বাংলার পাঁচ। চারেও নামবে না, ছয়েও আর উঠবে না।

বাবা বারাসাতে অফিস হওয়ার জন্য সময় কম। তাই দিদিমণি মাস্টার মশাইয়ের খুশির খবর শুনলেও, এমনকি পিসির আগমনের খবরও কানে গেলেও, সাক্ষাৎ এই প্রথম। দীর্ঘ চাকরি জীবনে বিভিন্ন স্থানে বহু মানুষের সঙ্গে মেশার ফলে আমার বাবা খুব লোক চেনে। একথা ছোটমা বলেছিল আমায়। আর ছোটমার বলা কথা আমার শিরোধার্য।

বাবাকে নিজের জীবন, কর্মজীবন, সঙ্গীত জীবন, সাহসী জীবনের গল্প শোনাতে থাকলেন পিসি। এক সময় রাতের খাবার ও চোখের ঘুম সবাইকে ঘরে নিয়ে চলে গেল, পড়ে থাকল বাবা আর পিসি। দু'জনের আলোচনা বেশ গম্ভীর মুখে চলতে শুরু করল। এক সময় ঘর ছেড়ে দু'জনে বারান্দায়। পিসির সঙ্গে কী গল্প করছ? মা শেষ ঘণ্টাখানেকের এন্টারটেনমেন্ট নাকচ করে দিচ্ছিল। মায়ের পান থেকে চুন খসলে, আদা থেকে জাহাজের খবর লাগলে সব ছোটমা সামলাত।

মায়ের মনের প্রশ্ন মেটাতে ছোটমা বারান্দায় এগোতে দ্যাখে, বাবা আসছে --- 'কী দাদা, কী গল্প করছিলেন পিসির সঙ্গে? পল্টুর (আমার ডাকনাম) মা খেতে দেবে যান।' সেটা আসল কারণ নয়, সে বাবাও জানে। আমার কাছে 'ওরেবাবা' অন্যের কাছে রসিক মানুষ ছিলেন। আলতো করে বলে উঠলেন --- 'দু'জনে বিড়ি ধরিয়ে সুখটান দিচ্ছিলাম।'

ছোটমার মুখে দু'টো হাঁসের ডিমভরা হাঁ --- ' পিসি বিড়ি খায়!' --- কিছুটা সময় নিয়ে বলে উঠল ছোটমা।

'সেকি! সে এত দেশদুনিয়া করেছে, এত পরিশ্রম করতে পারে, সে একটু আধটু টান দেবে না বিড়িতে!' 'আগুন', বলে বিড়ি এগিয়ে দিতেই, না না করছিলেন, তারপর চৈত্রের রোদের পর গাছপালায় জল পড়লে যেমন ঝটপটিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি উনি সুখটান দিয়ে শান্তি পেলেন।

'সে কোথায়?' ছোটমা বলল।

'কলে মুখ ধুতে গেছে।'

ছোটমা থ হয়ে সেদিন ভাবছিল, কাকে চিনলাম, পিসিকে না পল্টুর বাবাকে।

১৪ মার্চ

রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়

২০০১

বাবা সকালেই ঘোষণা করে দিয়েছে যতই বুধবার হোক, বাবা আজ অফিস যাবে না।আমারও স্কুলে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, তা আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি। দাভাই-এর সুবিধে, অমনিতেই অন সাইট করে ফিরেছে নাইজেরিয়ার লাগোস থেকে, তাই এক হপ্তা ছুটি। আসলে গতকাল শেষবেলা থেকে লক্ষ্মণ আর দ্রাবিড় দাঁড়িয়ে গিয়েছে, তার আগে দাদাও একটা লড়াকু ৪৮ করে আউট হয়েছে। এটা স্টিভ অয়া'র সেই দল, যার সাত নম্বরে গিলক্রিস্ট নামেন। যারা ভারতে এসেছে টানা ষোলো/সতেরোটা ম্যাচ জিতে।

আমাদের মাঝের ঘরে টিভি, তার লাগোয়া খাটে বাবা আধশোওয়া, পিছনের সোফায় দাভাই বসে, আমি মাটিতে থেবড়ে বসে আছি। তিনজনের হাতে সকালের জলখাবার রুটি, আলুর তরকারি আর চলে যাওয়া শীতের রয়ে যাওয়া জয়নগরের মোয়া। আমরা দুই ভাই খেলা দেখতে বসার আগে বাবার কাছে শপথ নিলাম উইকেট না পড়লে আমরা কেউ নড়ব না।

ইডেনে খেলা শুরু হল, তারপর যেটা হল, তা আর খেলার পর্যায়ে থাকল না। তা চলে গেল এক মহাকাব্যের পর্যায়ে।

গালাগালি, বাউন্সার, গিলেস্পির বোলিং করতে আসার সময় পাখি হয়ে ওড়ার চেষ্টা, যদি লক্ষ্মণ বিচলিত হয়। কিন্তু কোথায় কি? আমরা কী ব্যাটিং দেখছিলাম তা আমরা নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। শিল্প আর পরিশ্রমের এমন মিশেল খুব কম দেখেছি। এদিকে তো নিজেরাই প্রতিজ্ঞা করেছি জায়গা থেকে নড়ব না।এদিকে ব্লাডার ফাটবে ফাটবে করছে। আর এই সময় আমাদের বাথরুমও একটা। ড্রিঙ্কস ব্রেক হতেই বাবা বাথরুমে দৌড়। বাবা গেল, বাবার একটা সাদা রেশ রয়ে গেল। অর্থাৎ বাবা বাথরুমে পৌঁছলেও বাবার পাজামা পৌঁছল না, সে মাঝপথেই দেহত্যাগ করল।ভাল খেলবে তা আশা করেছিলাম বলেই সব কামাই করেছিলাম, তাই বলে এরকম অতিমানবিক তা-ও আবার দুজন ব্যাটারই এমন প্রতিরোধ গড়ে তুলবে
তা বোধ হয় কেউই ভাবেনি।এদিকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা মানে যে গর্তে ঢুকে যাওয়া নয়, তাও বুঝতে পারছিলাম সেদিন দ্রাবিড়-লক্ষ্মণের ব্যাটিং দেখে। নব্বই ওভার, ৫৪০ বল ভারতের এই দুজনের দুর্গ ভাঙতে পারল না। ইডেন আর বিজয়গড়ের আকাশে যখন বিকেল নামল ততক্ষণে চালকের আসনে আমরা। আমরাও এদিকে ক্লান্ত, সারাদিন কোত্থাও নড়িনি। মা টি-এর আগে আমাদের সঙ্গে খেলা দেখতে দেখতে নারকেল কোড়াতে বসেছিল, লক্ষ্মণ পরপর কয়েকটা চার মেরেছে বলে মাকে বাবা টি অবধি নারকেল কোড়াতে বাধ্য করেছে। নিজেদের গাছ তিনটে, ইয়াসিনদা পেড়ে দিয়েও গিয়েছে, তাই বলে কোড়ানো নারকেল কত আর লাগতে পারে?এখন মা গজগজ করছে। কিন্তু সেই গজগজেও প্রশ্রয় আছে, কারণ ফাঁকে ফাঁকে মাও খবর নিয়েছে খেলার। সন্ধের ধূপে আজ আনন্দের গন্ধ বিনবিনিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।বাবা ফিশ ফ্রাই আনতে দিয়েছে, দাভাই কোল্ড ড্রিঙ্কস এর। আজ চন্দন কাকুও বোতল জমার টাকা নিল না। সন্ধের বারান্দায় লিলুয়া বাতাসে মিশে গেল আমাদের ছোটখাটো বিলাসের গন্ধ ফিশ ফ্রাই সেজে।

২০০৯

গতকাল তড়িঘড়ি মালায়শিয়া থেকে ল্যান্ড করেছি, দাভাইও চলে এসেছে হায়দ্রাবাদ থেকে।আমি মালয়েশিয়াতে 'পরান যায় জ্বলিয়া রে'-তে গেস্ট আপিয়ারেন্স করতে গিয়েছিলাম। এখন আমি আর দাদা ঢাকুরিয়ার একটা বেসরকারি হাসপাতালে মুখোমুখি বসে। ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছে বাবার আর ফেরার রাস্তা বন্ধ। কৃত্রিম যন্ত্র খুলে ফেলা হবে কিনা তা নিয়ে আমাদের দুই ভাইকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিজেদেরই উইকেট পড়বে জেনেও আম্পায়ার হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আঙুল তুলে দেওয়া ছাড়া আমাদের দুজনের আর কিছু করার ছিল না।

সাড়ে এগারোটা বেলার সময় বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। আমি কী শুনছি কিছু জানি না,চারপাশে বাবার নাটকের দলের কাকুদের কান্না, টুকরো টাকরা বিলাপ কানে আসছে, আমি ঘোরের মধ্যেই দাভাইকে বললাম 'আমি বাড়ি যাচ্ছি, মাকে জানাতে হবে' কারণ আমি জানি এই কাজ আমার দাদা পারবে না।মা'র পার্টনারশিপ ভেঙে গিয়েছে। এটা দাদার পক্ষে মাকে বলা কঠিন, মায়ের একদম ছোটবেলার সন্তান তো দাভাই, অনেকটাই মায়ের বন্ধুর মতো।

কৃত্রিম যন্ত্র খুলে ফেলা হবে কিনা, আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিজেদেরই উইকেট পড়বে জেনেও আম্পায়ার হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে ঝাপসা চোখে তাকিয়ে আঙুল তুলে দেওয়া ছাড়া আমাদের দুজনের আর কিছু করার ছিল না।

একই বাড়ি, যেখানে ফিশ ফ্রাই-এর গন্ধ উড়ে বেড়াচ্ছিল আট বছর আগে, আজ সেই বাড়িতে মাত্র আট বছরের ব্যবধানে উড়ে বেড়াতে লাগল অগুরু আর রজনিগন্ধার অস্বস্তিকর গন্ধ। বাবা আবার অফিস কামাই করেছে, কিন্তু আজ অফিস নিজে বাবার কাছে চলে এসেছে। বাবার কত ছাত্র কাঁদছে কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যর গান থামাচ্ছে না।আমি কেওড়াতলা অবধি যন্ত্রের মতো কাজ করে গিয়েছি। কারণ আমার বাবা ছিলেন সব পিসির আদরের ছোট ভাই, আর ততদিনে 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এর জন্য আমার দিকে সবাই তাকিয়েও ছিল। আমার হঠাৎ মনে পড়ল বাবা আর ক্রিকেট দেখবে না। বাবার সঙ্গে গাভাস্কার-তেন্ডুলকর নিয়ে তর্ক হবে না। আমি হঠাৎ টের পেলাম চুল্লির ভিতরে শোওয়ানো শরীরটা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড-এর। যে জোয়ারটা বুকের ভিতর ফুলছিল এবার তাতে বন্যা এলো।

আড্ডা

সুমন সেনগুপ্ত

আমার জীবনে আড্ডার সূত্রপাত ছোটবেলায় খেলার মাঠে। সেখানে খেলার শেষে কয়েকজন পাড়ার বন্ধু মিলে নানান গপ্পো করতাম। সে সব গপ্পের মূল বিষয় ছিল পাকা ছেলেদের লেখা জীবন বিজ্ঞান! তারপর ইলেভেনে উঠে আমার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে। আমি ছোটবেলা থেকে তথাকথিত 'মেধাবী ছাত্র' ছিলাম। ক্লাসে ভাল নম্বর পেয়ে র্যাঙ্ক করতাম। কিন্তু, পড়াশুনা করলেও আমি ছিলাম আদ্যন্ত গপ্পোবাজ মাল। মানে, আমার মাথা ছিল নানান ধরনের খিটকেলপনার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার। কিন্তু, এই পড়াশুনা আর বাড়ির চাপে আমার বিচ্ছুসত্তার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। যাইহোক, আমি দুম করে ৭১৯ পেয়ে মাধ্যমিকের টেস্টে ফার্স্ট হয়ে গেলাম। জীবনে প্রথমবার প্রথম হলাম কোনও পরীক্ষায়! সেটাই কাল হল। যারা বনেদি বড়োলোক নয়, হঠাৎ ক্যাড়াব্যাড়া থেকে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তাঁদের দেখবেন পয়সা রাখতে পারে না, উড়িয়ে দেয়, তারপর একদিন নিজেও উড়ে যায়। আমার হল সেই অবস্থা। লোকে এতো গ্যাস খাইয়ে দিল যে, আমি ভাবলাম রাজ্যের মধ্যে র্যাঙ্ক করবো। কিন্তু, মাধ্যমিকে টেস্টের থেকে ২৭ নম্বর কমে গিয়ে পেলাম ৬৯২। রাজ্য তো দূরের কথা, চন্দননগরে প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে ছিলাম না। সাল ২০০২। মনে মনে বললাম, এত পড়াশুনা করে, এত ঠাকুরকে ডেকে, এই অবস্থা! তারপর পড়াশুনা আর ঠাকুর দু'জনের সঙ্গেই আমি সম্পর্ক ছিন্ন করলাম।

মাধ্যমিকের পর দুটো বছর স্রেফ আড্ডা মেরে কাটিয়ে দিলাম। আমার ভিতরে থাকা আড্ডাবাজ, খিল্লিবাজ মানুষটা পূর্ণ অবয়ব লাভ করল। তখন আবার অনেক

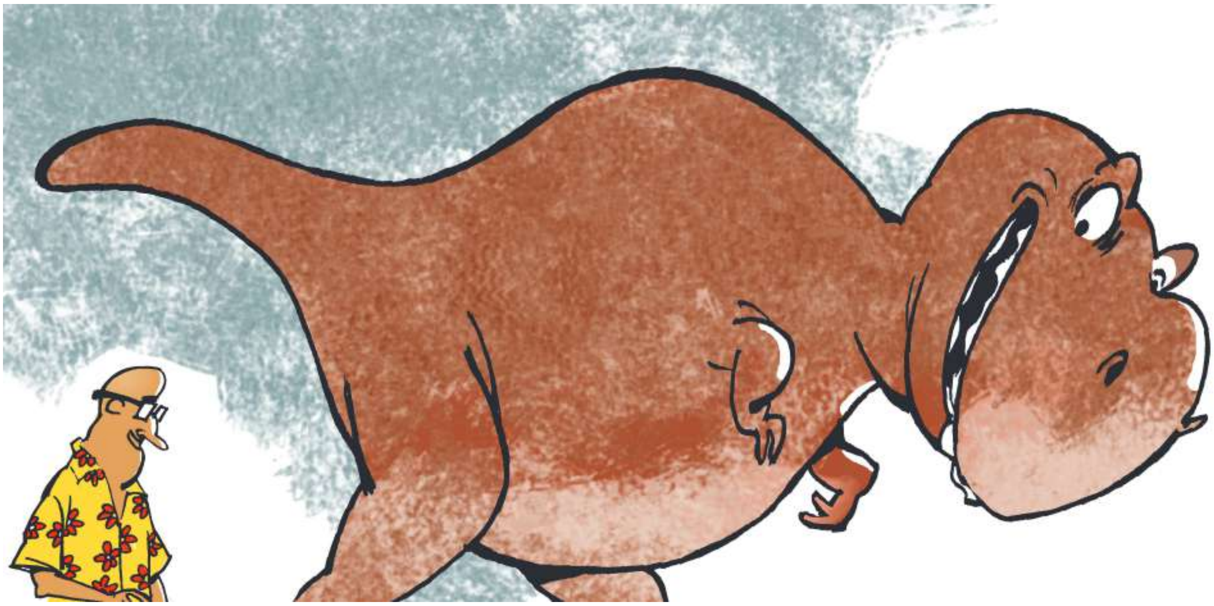

বান্ধবীও জুটেছেন! তখন আড্ডা মানে ছিল পড়তে যাওয়া। ইলেভেন-টুয়েলভে টিউশন ক্লাসে কি পড়ানো হয়েছে আমি কিসসু জানি না। কারণ, সারাক্ষণ খিল্লি করতাম। স্কুলেও তীব্র খিল্লি, একাধিক এঁচোড়ে পাকা বন্ধু। ক্লাসে মণিবাবু ফিজিক্স পড়াচ্ছেন আর আমার পাশে বসে বিপি (আসল নাম বলছি না) বলছে - 'বুঝলি, আমার বিয়ের পর একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হবে'। আমি বলছি – 'একটা মেয়ে আর একটা ছেলে এইটা কী করে শিওর হচ্ছিস' ? বিপি বলল – 'কাল স্টেশনে একটা বই দেখলাম – ইচ্ছে মতন পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভ করার উপায়'। এইসব করতে করতে হায়ার সেকেন্ডারি চলে এল। আমি হায়ার সেকেন্ডারি দিলাম নিজে পড়ে! কারণ, স্কুল বা টিউশনির পড়া কিসসু শুনিনি। ইশ, বাবার অনেকগুলো পয়সা নষ্ট হয়েছিল টিউশনির পিছনে। যে ফিজিক্স ক্লাসে আমি আর বিপি বসে বসে এক পুত্র সন্তান আর এক কন্যা সন্তানের হিসেব মেলাচ্ছিলাম, সেই ফিজিক্স পরীক্ষায় আমি আর বিপি দুজনেই লেটার পেয়েছিলাম! উচ্চ মাধ্যমিকে স্টার পেলেও, নম্বর আশানুরূপ নয়। অবশ্য ওইটুকু পড়ে স্টার পেয়েছিলাম বলে নিজের মেধার উপর আজকাল সিরিয়াসলি গর্ব হয়! যাইহোক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হওয়া আর তার রেজাল্ট বেরনো---এর মধ্যে যে লম্বা সময় সেটাই ছিল নিজেকে আড্ডার স্টার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সময়। চন্দননগরে গঙ্গার ধারে রোজ বিকেলে বসতো আমাদের আড্ডা। সেখানে মাঝেমাঝে আমাদের বান্ধবীরাও আসতেন। তখন সিগারেটে টান দেওয়া শুরু করে দিয়েছি। আমাদের গ্রুপে প্রায় সকলেই ছিল তথাকথিত ভাল ছেলে। গুলু নামে এক পিস ছেলে ছিল, যে প্রচুর গুল মারত। আর ছিল চুসি নামের এক বন্ধু। সে ছিল মহাকৃপণ। কলেজে ভর্তি হবার পর আমাদের সকলেরই লেজ গজিয়েছিল। এই জন্যই 'ক-লেজ'! যাইহোক, লেজ ছাড়াও আমাদের অনেকেরই হাতে একটা করে মোবাইল গজিয়েছিল। কিন্তু ফোন করতে গেলে অনেক টাকা লাগে। তাই, আমরা মিসড কল দিতাম। একটা মিসড কল মানে – 'এসে গেছি', দুটো মিসড মানে 'অনেকক্ষণ এসে গেছি' - এইরকম আর কি। কোনও কোনও উজবুক ইচ্ছাকৃত সেই মিসড কল ধরে বিচ্ছিরি মজা পেতো। আমাদের বন্ধু চুসি যখন মিসড কল মারতো, তখন মোবাইলে শুধু আলো জ্বলতো, কোনও রিংটোন বাজতো না। 'আলো শব্দের থেকে দ্রুততর' - এই সত্য প্রমাণ করতে চুসির মিসড কল ছিল সেরা এক্সপেরিমেন্ট! চুসির ভয় ছিল যদি কেউ মিসড কল ধরে ফেলে! ফোনের কোম্পানি অনেকগুলো টাকা কেটে নেবে! এছাড়াও ছিল পাদুকা নামে এক বন্ধু। ওঁর গার্লফ্রেন্ডের বাবার জুতোর দোকান ছিল। সেই দোকানের একটি দুর্গন্ধময় জুতো পাদুকার কল্পনায় থাকা হবু শ্বশুর পাদুকার মুখে মারতে আগ্রহী ছিলেন। যাইহোক, পাদুকার সঙ্গে যেদিন ওঁর প্রেমিকার ঝগড়া হত, পাদুকা আমাকে বলতো – 'যেদিন গোপাল বাবুর ঘাটে পুড়বো সেদিন আমি শান্তি

পাবো'। এদিকে আমিও তক্কে তক্কে থাকতাম। কারণ, পাদুকা এরপরেই বলত– 'চল কচুরি খাওয়াবো'। পাদুকা শ্মশানের কথা বললেই আমার চোখে পাদুকার চিতা নয় শালপাতায় গরম গরম কচুরির দৃশ্য ভেসে উঠত।

উচ্চ-মাধ্যমিক পাশ করে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে স্ট্যাটিস্টিকস পড়তে ঢুকি। প্রেসিডেন্সি কলেজে ক্যান্টিন চত্বরে আড্ডার পরিবেশ অসাধারণ। কিন্তু, আমি ছিলাম মফঃস্বলের নিতান্ত ছাপোষা পরিবারের ছেলে যে চে গ্যেভারা সম্পর্কে জানতো না। তাছাড়া রাজনীতি বুঝতাম না। দেশ বা সমাজ যে কোনওদিনই পালটাবে না সেই দিব্যজ্ঞান আমার কলেজে ঢোকার আগেই ছিল। তাই কলেজ স্ট্রিটে বিপ্লব করিনি। কলেজে কোনও আড্ডা ছিল না। আমার আড্ডার জায়গা ছিল চন্দননগরের গঙ্গার ঘাট। কিন্তু, সেখানেও লোক কমে গিয়েছে। কেউ কেউ প্রেম করছে বলে আড্ডাকে বিদায় জানিয়েছে। কেউ কেউ আবার নিজেদের কলেজ নিয়ে মেতে উঠেছে। পাদুকা নতুন একজন প্রেমিকার জন্য চেষ্টা করছে। গুলুর নতুন নাম হয়েছে মশারি! কারণ, এক বন্ধু দেখেছে সে রাস্তার ধারের একটা বাড়িতে বসে একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। মেয়েটি মশারির ভেতরে, গুলু বাইরে চেয়ারে বসে! কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় আমি হিন্দু হস্টেলে চলে আসি। পার্ট ওয়ানে ফার্স্ট ক্লাসের কাছাকাছি নম্বর পেয়েছিলাম। তাও একটু পড়াশুনা করেছিলাম বলে মনে হয়। কিন্তু, পার্ট টু-টা একেবারে ধাপার মাঠে পাঠিয়ে দেব বলেই হয়তো থার্ড ইয়ারে হিন্দু হস্টেলে এলাম। সেখানে জমে উঠলো আড্ডা। রুমে থাকতাম আমি, রাহুল, মুন্না আর গুলবদন। গুলবদনের গুল ছিল গুলুর থেকেও শক্তিশালী। সে ডায়েরিতে মিথ্যে কথা লিখে রাখত, আর সেই ডায়েরি সকলের সামনে রেখে চলে যেত। আমরা রোজই প্ল্যান করতাম রাতে প্রচুর পড়াশুনা করব। রাহুলের সাবজেক্ট ছিল অর্থনীতি, মুন্নার বটানি, গুলবদনের রসায়ন। কিন্তু, সারারাত চুটকি মশলা সহযোগে প্রচুর বিড়ি, সিগারেট খেয়ে জমিয়ে আড্ডা হলেও পড়াশুনা হত না। এভাবেই দিন কেটে গেল। পার্ট টু দিলাম, জঘন্য পরীক্ষা হল। হস্টেল ছাড়তে হল। হিন্দু হস্টেলের আড্ডার সমাপ্তি। জঘন্য রেজাল্ট করলাম। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, আইআইটি, আইএসআই কোথাও চান্স পেলাম না। আপনি লাইফে যখন ফুর্তির প্যারাশুট বেঁধে অনেক উড়বেন, লাইফ একদিন দুম করে সেই প্যারাশুট মাটিতে নামিয়ে দেবে। আমি এরপর কল্যাণী ইউনিভারসিটিতে এমএসসি পড়তে গেলাম।

> পাদুকার সঙ্গে যেদিন ওঁর প্রেমিকার ঝগড়া হত, পাদুকা আমাকে বলতো – 'যেদিন গোপাল বাবুর ঘাটে পুড়বো সেদিন আমি শান্তি পাবো'। এদিকে আমিও তক্কে তক্কে থাকতাম। কারণ, পাদুকা এরপরেই বলত– 'চল কচুরি খাওয়াবো'

মাধ্যমিকের পর আমি যে সিরিয়াসলি পড়াশুনা করা বন্ধ করেছিলাম, সেই ফর্ম আমার অটুট ছিল কলেজ অবধি। কিন্তু, তারপর লাইফ যখন ভাগাড়ে পৌঁছে গেল তখন বুঝলাম, এবার সিরিয়াসলি পড়তে হবে। তাই এমএসসি পড়ার সময় সিরিয়াসলি পড়াশুনা করতাম। কিন্তু, আমার মধ্যে থাকা আড্ডাবাজ মানুষটা হারিয়ে যায়নি কোনও দিন। আমি প্রচুর বাজে বকতে পারতাম, মিমিক্রি করতে পারতাম, জন্মগত অভিনয় ক্ষমতা থাকায় যে কোনও আড্ডা জমিয়ে দিতে পারতাম। কল্যাণীর মতো নতুন একটা জায়গায় আমার একাধিক আড্ডার ঠেক ছিল। ভাসানদার চায়ের দোকান, রামদার ক্যান্টিন, মইদুলের মেস, জগাদের বাড়ি। সেখানেও একাধিক হাই লেভেল কিপটের সাক্ষাৎ পেয়েছি। আড্ডায় আমাদের বান্ধবীরাও থাকতেন। কিন্তু তাঁরা অনেকেই আড্ডা মারতে এসে তাঁদের বয়ফ্রেন্ডদের সঙ্গে ফোনে 'মনখারাপ মনখারাপ' নামে একটি খেলা খেলতেন। কিন্তু, কোথাও যেন আমি মিস করতাম আমার সেই গঙ্গার ধারের আড্ডা। সেইসব বন্ধুরা তখন কেউ বিদেশে, কেউ ভিন রাজ্যে চাকরি করছে, কেউ পিএইচডি করছে। যাইহোক, আমি এমএসসি কমপ্লিট করে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটে পিএইচডি করতে ঢুকলাম।

আইএসআইতে পিএইচডি করতে ঢুকে আমার আস্তানা হল রিসার্চ স্কলার'স হস্টেল। এমনিতে আইএসআই-তে ভয়ংকর ব্রিলিয়ান্ট ছেলেমেয়ের ভিড়। ধরুন আপনার পাশে বসে একটি ছেলে নাক খুঁটছে। তাঁকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন – 'তুমি নেট পরীক্ষায় কত র্যাঙ্ক করেছ?' ছেলেটি নাক থেকে আঙুল বার করে আপনার সামনে তুলে ধরবে। কিছু বুঝলেন? ছেলেটি নেট পরীক্ষায় এক র্যাঙ্ক করেছে, সেটাই ওই একটা আঙুল দিয়ে বোঝাতে চাইছে! আমি প্রথম কিছুদিন হস্টেলে ঢোকার পর কুঁকড়ে থাকতাম। আমার মতন তীব্র খিল্লিবাজ ছেলে

এখানে এত সিরিয়াস ছেলেদের মাঝখানে কী করবে! কিন্তু, কিছুদিন থাকার পর আইএসআই হস্টেল সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে গেলো। এখানেও তীব্র খিল্লিবাজ ছেলেদের ভিড়। রতনে রতন চেনে, ওরাও আমাকে দেখে বুঝে গেল। আইএসআই-তে ঢোকার পর আমার দু'টো আড্ডার গ্রুপ ছিল। একটা ছিল ডিপার্টমেন্টে, আর একটা ছিল হস্টেলে। ডিপার্টমেন্টে আমাদের চার-পাঁচ জনের একটা গ্রুপ ছিল। আমরা একটি দশতলা বিল্ডিং এর ন'তলায় বসতাম। দশতলার ছাদে দারুন আড্ডা জমত। এছাড়া ছিল গোপাল লাল ঠাকুর রোডের উপর আংকেলের দোকান অথবা কাকার চায়ের দোকানের আড্ডা। সেখানে আমাদের এক বন্ধু ছিল মহাপ্রেমিক। সে ফোনে খুবই ব্যস্ত থাকত। ফোন এলেই সে উঠে চলে যেত। আমরা তখন তাঁর দুধ-চায়ে নুন মিশিয়ে দিতাম। সে ফোন সেরে ক্লান্ত অবস্থায় ফিরে সেই চা খেয়ে নিত। মুখটা এমন ছিল যে, ভালবাসায় যে কষ্ট গিলছি তার তুলনায় এই নুন দেওয়া দুধ-চা তো অমৃত! আর এক বন্ধু মহাপ্রেমিক না হলেও প্রেমিক ছিল, কিন্তু নিজেকে লুকিয়ে রাখত। সম্ভাব্য প্রেমিকার নাম সে সেভ করেছিল 'ভোডাফোন' দিয়ে। কেউ একজন ওঁর ফোনের দিকে চেয়ে বুঝতে পারে এই ভোডাফোন সেই ভোডাফোন নয়। আড্ডার সঙ্গী ছিল আংকেলের ঝালমুড়ি, অমলেট, চানাচুর মাখা এইসব। ওখানে আবার লাইন দিতে হত আড্ডার জন্য। এক সেট লোকজন আড্ডা দিচ্ছে। তাঁরা উঠলে আমরা জায়গা পাব, আবার আমরা উঠলে পরের গ্রুপ। ক্যাম্পাসে অনেক ইন্টারেস্টিং লোকজন ছিল যাদের সঙ্গে টুকটাক আড্ডা হত। বলা উচিত, ওঁরা আড্ডার রসদ জুগিয়ে যেত। যেমন 'খবরিলাল'। সে ছিল ক্রিপ্টোগ্রাফির মেধাবী গবেষক, কিন্তু ওর নেশা ছিল গসিপ কালেকশনের। ওর কাছে আমরা প্রেম, পরকীয়া, কেচ্ছা এইসব বিষয়ে নানান মুচমুচে গসিপ পেতাম। এছাড়াও ছিল 'ম্যাক্রো' নামের এক বন্ধু। তাঁকে 'ভাল আছিস' বললেই গালাগাল দিত। কারণ, সে ছিল অর্থনীতির গবেষক! যেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ ভাল নেই, সেখানে 'ভাল আছিস' জিজ্ঞাসা করাটা একটা অপরাধ। আমি একদিন ওকে বলি – 'দেখ, মানুষ ভাল নেই বলেই তো তোরা পেপার লিখছিস, ভাল থাকলে হয়তো মোমো বেচতিস'! আমাকে পেট ভরে গালাগাল দিয়েছিল। ডিপার্টমেন্ট থেকে সন্ধ্যায় হস্টেলে ফিরতাম। তারপর মেসে ডিনার করতে গিয়ে জমিয়ে আড্ডা হত। সেই আড্ডার নাম ছিল – 'ভাঁট'। কম্পিউটার সায়েন্স, ইকোনমিক্স, স্ট্যাটিস্টিকস ইত্যাদি নানান বিষয়ের রিসার্চ স্কলাররা সেই আড্ডায় থাকত। এমনিতে পিএইচডি লাইফ মোটেই ভাল নয়। একটা অনিশ্চয়তা সবসময় লেজ টানছে। বন্ধুরা চাকরি পেয়ে ফেসবুকে বিয়ে, হনিমুন, লাল-নীল সংসারের ছবি দিচ্ছে আর আমরা কালুদার বিড়ি মেশানো শাক আর থার্ড ক্লাস চিকেন খেয়ে দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু সব দুঃখ কষ্ট মিলিয়ে যেত ওই ঘণ্টা খানেক আড্ডার পর। গরমকালে হস্টেলের মাঠে বসে আড্ডা হত। আড্ডা মারতে মারতে অনেক রাত হয়ে গেলে কেউ গিয়ে কেষ্ট ঘোষের দোকান থেকে গরম গরম মিষ্টি নিয়ে আসত, অবশ্যই চাঁদা তুলে। হস্টেলে একজন রিসার্চ স্কলার ছিল, সে অনেক বেশি বয়সে পিএইচডি করতে ঢুকেছিল। সে লোকজনকে নানাভাবে বিরক্ত করত। কিন্তু, কেউ তাকে জব্দ করতে পারত না। মাথায় শোভা পেত চকচকে টাক। তাকে আমরা 'টাকলামাকান' বলে ডাকতাম। আমি একদিন চ্যালেঞ্জ নিলাম তাকে শায়েস্তা করার। আইএসআই মিউজিয়ামে একটা বিশাল ডায়নোসরের কঙ্কাল ছিল। অনেকেই দেখতে আসত। আমি একদিন ডিনার করতে করতে টাকলামাকানকে উদ্দেশ্য করে বললাম – 'আমাদের মধ্যে একমাত্র টাকলাদা এই ডায়নোসরকে হেঁটে চলে বেড়াতে দেখেছে। টাকলাদা আর ডায়নোসর একই বয়সি'। এই কথা শুনে সেখানে বসে থাকা সকলেই হো হো করে হাসতে থাকে। অনেকে হাসতে হাসতে মাটিতে বসে পড়ে। টাকলাদা বলে, আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারি। আমি বলি, বয়সটা কম বললাম বলে মামলা করবে? আচ্ছা, সরি। তুমি তো ওই ডায়নোসরের দাদুর বিয়েতেও ছিলে। এটা শুনে টাকলাদা উঠে চলে যায় রেগে মেগে। এভাবেই কত আড্ডা হয়েছে, দারুন সময় কেটেছে। তারপর কেউ কেউ চাকরি পেয়ে গেল, কেউ বিদেশ চলে গেল। দল ভাঙা শুরু হল। আমি সেখানে ছিলাম সাড়ে পাঁচ বছর। তারপর একদিন থিসিস জমা দিলাম। হস্টেল জীবনের চিরকালের মতন ইতি। ইতি আমার জীবনে আড্ডারও।

এখন আমার জীবনে আড্ডা নামে কিছু নেই। সাত বছর হল চাকরি করছি। বিয়ে, ফ্ল্যাটের ইএমআই, সন্তান, শাশুড়ি–বউমা ঝামেলা, কাজের দিদির কামাই --- এ সবের মধ্যে বেঁচে আছি। আমার মতন আড্ডাবাজ প্রতিদিন মিস করে আড্ডা। মাঝেমাঝে স্বপ্ন দেখি আড্ডার। এখন আমি জীবনের এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে আমার চারদিকে শুধু কবর। আড্ডার কবর। কবরের উপর খোদাই করা আছে আড্ডার তারিখ, সঙ্গী। এই সব ক'টা কবরে একটু একটু করে 'আমি' আছি। আমি এই স্মৃতির কবরস্থানে ঘুরে বেড়াই অতৃপ্ত আত্মার মতন।

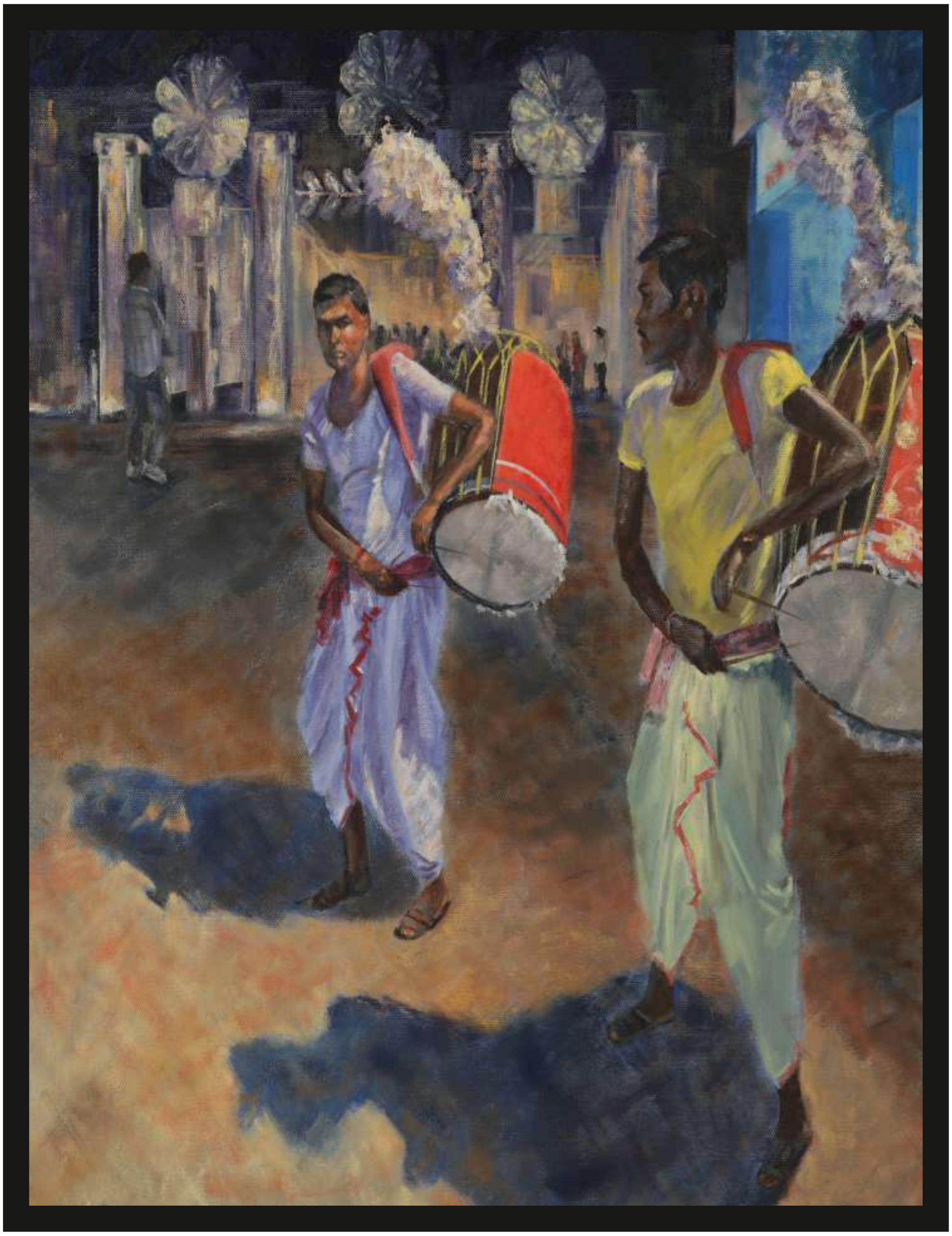

Artist Biography

Having moved to California from India in her early twenties, Shubhra Sarkar was captivated by the natural beauty and the charm and traditions of her new home. With her Engineering background, she worked in the tech industry while continuing to explore the world. As she travelled, she was moved by the beauty and history of the different places and wanted a way to share her experiences. That compelled her to pursue art. She received her MFA (painting) from Academy of Art University, San Francisco in 2024. She has been part of art exhibitions in galleries in San Francisco and the greater Bay Area. She has won competitions in Triton Museum, Santa Clara and Teravarna, International online Juried show.

রূপসজ্জা

বসুন্ধরা মিত্র

রাগে দুঃখে অমলের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো। আনন্দ উৎসবে সাজগোজ করতে কে না চায়। জন্মদিন, পয়লা বৈশাখ, পুজো - এই কটা দিনে নতুন জামাকাপড় অতি আবশ্যক - অন্তত ছোটবেলা থেকে অমল তো তাই জানে। ঠাম্মা বলতেন, নতুন পোশাক নতুন আশার স্বরূপ।

কিন্তু অমলেরর সেই আশায় হিমশীতল জল ঢেলে ওর মা ঘোষণা করল, "এ বছর পুজোয় না হয় নতুন জামা কাপড় থাক। সবারই তো অঢেল আছে - আর বাড়িয়ে কি লাভ। ভক্তি থাকুক হৃদয়, প্রদর্শনে নয়।"

অমল শুনে তো হাঁ। এটা কোন কথা হলো! একটা জামায় কি বা আসে যায়! তবে অমল কিচ্ছুটি বলল না। তার ওই একটা দোষ - সে বড় লক্ষী ছেলে। সাত চড়ে রা কাড়ে না। নিঃশব্দ অভিমানে সে ভারী পায়ে মাঠের বেঞ্চিতে গিয়ে বসে রইল। বসে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।

মাকে কি ঠাম্মার যুক্তি বোঝানোর চেষ্টা করবে? নাকি আবদার করলে মায়ের মন গলবে? তর্ক করার অভ্যাস নেই যে তার। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো অমল। ভালো ছেলে হওয়া সহজ নয়। হৃদয়ের চোরা কুঠুরিতে নিজের বিপরীত মতামত আর যুক্তিযুক্ত ক্ষোভকে তালাচাবি বন্ধ করে রাখতে হয়। পারলে চাবিটাও ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়।

আস্তিনে চোখের জল মুছে অমল ঝাপসা দৃষ্টিকে একটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করলো। চারিদিকে পুজোর

তোড়জোড়ে সবাই মেতে উঠেছে। এই মাঠেই দুর্গাপুজো হয়। শারদোল্লাসের কোলাহলে চারিদিক মাতোয়ারা। আয়োজকরা ঢাকিদের সঙ্গে পারিশ্রমিক নিয়ে বাকবিতণ্ডায় ব্যস্ত। সংস্কৃতি বিভাগের শিল্পীরা আবেগ সহকারে কলাচর্চায় মগ্ন। আর বাচ্চারা? অহেতুক গলার জোরের আর পায়ের গতির প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত।

অমলের মন মেজাজ আজ ভারাক্রান্ত। আনন্দের কলরব যেন তার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়াচ্ছে। সে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই শুনতে পেল, "তোমার বোধহয় এখানে ভালো লাগছে না, তাই না?"

একজন ঝাঁকড়া চুলওয়ালা অল্পবয়স্ক লোক তার দিকে হাসি হাসি মুখে চেয়ে আছে। এগিয়ে এসে সে নিজের পরিচয় দিল,"আমি হচ্ছি এই পুজো সমিতির অফিসিয়াল ফটোগ্রাফার। শুধু পূজানুষ্ঠানের নয়, এই উৎসবের আবেগ অনুভূতিরও ছবি তুলতে চাই। অনুমতি দিলে তোমার কয়েকটা ছবি তুলতে পারি?"

"আবার আমার ছবি কেন," বিরক্তিতে বিড়বিড় করতে করতে অমল পা বাড়ালো।

"না মানে, তুমি এখানে থেকেও নেই। তোমার এই মায়াবী বিষন্নতা আমাকে টেনে আনলো। খালি একটা ছবি?"

"না না প্লিজ," অমল আর কথা না বাড়িয়ে বাড়ির দিকে ছুট লাগালো।

শঙ্খধ্বনি আর আগমনী সুরের স্পন্দনে ত্রিনয়নী মা এসে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময়ের শেষে সবার মন ভার করে চলেও গেলেন।

অমলদের পুজোর ছুটিও শেষ হয়ে গেল। একদিন স্কু ল থেকে ফিরে দেখল একটা বড়োসড় খাম এসেছে। খামের উপর অমলের নাম লেখা। অবাক হয়ে ওটা খুলতেই দুটো ছবি বেরিয়ে এলো। আর একটা ছোট্ট লেখনি।

"তোমার অনুমতি বিনাই ছবি তুলেছিলাম, মাফ চাইছি। তাই ছবিগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট না করে শুধু তোমাকেই পাঠালাম।"

ও, ক্যান্ডিড শট! এবার আর অমল রাগলো না। কৌতূহল ভরা চোখে ছবিগুলো হাতে তুলল।

প্রথম ছবিটাতে অমল আর ওর ছোট বোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে। অমলের একটা হাত ওর বোনকে আগলে রেখেছে যাতে সে ভীড়ে ধাক্কা না খায়। অন্য হাতের আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে বোনের ঠোঁটের কোণা মুছে দিচ্ছে।

অমলের ভালো লাগলো ছবিটা। বোনকে সে খুব ভালোবাসে।

ছবিটার পেছনে দেখল লেখা আছে ক্যাপশন - 'স্নেহের সাজে উজ্জ্বল'

দ্বিতীয় ছবিটা হাতে তুললো অমল। দেখেই জিভ কাটলো। সেদিন ঝগড়াটা একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। আসলে ফুচকাওয়ালাটা এমন অকথ্য ভাষায় মেয়েটিকে গালাগাল দিচ্ছিল যে অমল ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। মেয়েটি ঠিক পাশেই ছোলা বিক্রি করছিল বলে ফুচকাওয়ালার এত রাগ। যেন জায়গাটা ওর রাজত্ব! শান্তভাবে থামতে বলেছিল অমল, কিন্তু সে গ্রাহ্যই করেনি। অগত্যা অমলকে গলা চড়িয়ে পুলিশের ভয়ে দেখাতে হয়েছিল। ব্যাপারটা মনে পড়াতে এখন একটু হাসিই পেল।

এটার ক্যাপশন কি দিয়েছে? 'শক্তির আবরণ মা দুর্গারও প্রিয়'

ভালো লাগলো অমলের।

হঠাৎ মনে হল, দুটো ছবির বর্ণনাই তো আমার নতুন রূপের কথা বলছে। নতুন জামা কাপড় ছাড়া রূপ তাহলে বদলানো যায়? পোশাক কি তাহলে বস্ত্র-নির্ভর নয়?

ছবিগুলো খামে ঢোকাতে গিয়ে অমলের চোখ পড়লো কোণায় ছাপা ফটোগ্রাফারের নামের ওপর - শান্তি রঞ্জন মিত্র।

বুকটা একটু কেঁপে উঠলো। ঠাম্মার নাম যে ছিল শান্তি।

ছিঃ !

অমিতাভ বসু

ছিঃ ! এরা কি মানুষ? নাকী অন্য কিছু !!
নইলে ... আমরা তবে কী? উত্তর নেই এ প্রশ্নের –
কে দেবে উত্তর! সভ্যতার দম্ভ ঘুচে মাথা আজ নীচু –
এদের পশু বললে মিথ্যে অপমান করা হয় পশুদের!
এদের কার্যকলাপে তাদের মাথাও হেঁট হবে নিছক লজ্জায় – শুধু বলবে 'ছিঃ' !

কপট মুখোসের অন্তরালে নারী ও পুরুষ, না-মানুষ না-জন্তু এরা অমানুষ –
দু-পায়ে হাঁটছে বলেই মনুষ্যত্ব দাবী করিবার, কে এদের দিলো অধিকার?
ঢাকা দিতে নিজেদের দোষ – পুঞ্জীভূত লোভ আর দীর্ঘকালীন অবিচার –
দুর্নীতির প্রতিবাদী যথার্থ মানুষের প্রতি প্রতিহিংসার নামে হত্যা-ব্যভিচারে,
হিংসার মুখোস পরে' উদ্যত-ফণায়, লোলুপ লালসা যারা তৃপ্ত করে নির্বিচারে ...
বিভীষিকা-ময় ঘৃণ্য জঘন্য অত্যাচারে, নির্বিকারে বলি দেয় তাহাদের নির্দোষ শিকারে –
জনতার আদালতে সে অন্যায়ের শাস্তি যত, মাথা পেতে নিতে হবে একে একে সব।
সর্বংসহা যত নাগরিক সুধীজনে সহিতে পারে না আর, চাহে না তো রহিতে নীরব –
শহরে গ্রামেতে যত প্রতিবাদী কবি-দল গিয়েছে কোথায় আজ – শোকস্তব্ধ কলমের গতি?
কলকাতা জন্ম দিল নব-দ্রৌপদীর, নব-কুরুক্ষেত্র তৈরী হবে আজ, চলেছে তাহার প্রস্তুতি।।

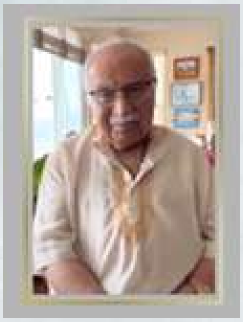

Obituary – Mr. Ramen Chakraborti
Founding Member of Prabasi

It is with heavy hearts that we announce the passing of our dear Ramen da (Mr. Ramen Chakraborti), one of Prabasi's founding members and a true pillar of our community for over five decades.

An alumnus of Jadavpur University, Mechanical Engineering, Class of 1954, Ramen da carried his academic brilliance and professional achievements with the same humility and dedication that defined his life of service. His vision was instrumental in establishing Prabasi as a cultural and philanthropic organization, ensuring that Bengalis in the Bay Area could celebrate their heritage, traditions, and community spirit away from home.

Beyond his leadership, Ramen da also served the community in a deeply spiritual way — as a priest for the Bengali Hindu community in the Greater San Francisco Bay Area. For decades, he conducted Durga Puja ceremonies, as well as countless personal and family rituals, offering guidance, blessings, and comfort. His devotion created a sacred bridge between tradition and diaspora life, and his presence during these rituals will be profoundly missed.

For more than fifty years, Ramen da was not just a leader, but a guiding light. His warmth, compassion, and tireless efforts inspired generations of community members to come together in celebration, service, and mutual support. He believed that Prabasi was more than an organization — it was a family — and he lived that belief every day.

Ramen da's legacy of service, compassion, spiritual leadership, and community building will continue to inspire us as we carry forward the work he helped begin. His contributions to Prabasi and to the wider community have touched countless lives and will always be remembered with deep gratitude.

We extend our heartfelt condolences to his family and invite our community to honor his memory by living the values he so passionately embodied — unity, service, faith, and cultural pride.

With respect and remembrance,
Bay Area Prabasi

শ্রীমতী রেখা রায়ের উদ্দেশে প্রবাসীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের এই সানফ্রানসিসকো বে-এরিয়ার প্রবাসী শ্রীমতী রেখা রায় সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন । আমাদের সকলের কাছেই তাঁর এই চিরবিদায় নি:সন্দেহে এক অপূরণীয় ক্ষতি ।

গত দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরে তাঁকে তাঁর স্বামী অরুণ রায়ের সঙ্গে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের মধ্যে । প্রবাসীর জন্মমুহূর্ত থেকে শুরু করে যুগে যুগে প্রবাসীর নানা অনুষ্ঠানে রেখাদির সান্নিধ্য, সাহচর্য এবং সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছি আমরা। কর্ম জীবনে শিশু-শিক্ষার কাজে তিনি ছিলেন নিয়োজিত, শিক্ষকতা করেছেন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। নৃত্য-শিল্পে পারদর্শিনী ছিলেন তিনি। তাঁর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করেছে প্রথম যুগের প্রবাসীর অসংখ্য অনুষ্ঠান। তাঁর নিজস্ব উপস্থাপনার পাশাপাশি তাঁর প্রশিক্ষণের গুনে অন্যান্য শিল্পীরাও অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে দর্শকদের।

অসামান্য রন্ধন-পটিয়সী ছিলেন তিনি। বন্ধু মহলের রসনা-পরিতৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বে এরিয়ার নবাগত অনেক নববধুর রন্ধন শিক্ষার ভার তিনি বহন করেছেন হাসিমুখে। কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন সেইসব নবদম্পতিকে। অচেনা মানুষকে আপন করে নেওয়ার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল তাঁর। বিপদে আপদে অগনিত বন্ধুর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তিনি অকাতরে - সে-ব্যপারে সর্বদাই তিনি ছিলেন নি:স্বার্থ ও নিরলস। বে এরিয়াতে অনেকেই রেখা-দির বিশেষ স্নেহ-ধন্য।

শ্রীমতী রায়ের চির-বিয়োগে তাঁর আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, ও পরিচিত সকলেই শোকাহত। প্রবাসী-র বৃহত্তর পরিবারেও নেমে এসেছে সেই শোকের ছায়া - সেই শোকের সান্ত্বনা দেওয়ার মত ভাষা আমাদের জানা নেই।

গত ৫ ই আগস্ট, ২০২৫, শ্রীমতী রায় পরলোক গমন করেছেন। অমৃতের পথে সেই অনন্ত যাত্রা আনন্দময় হোক। প্রবাসী জনের মনে ওঁর স্মৃতি থাকুক সদা-জাগরূক। মাতৃ পুজার প্রাক্কালে, আসুন আমরা সকলে ওঁর অমর আত্মার শান্তি-কামনায় প্রার্থনা করি - ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥

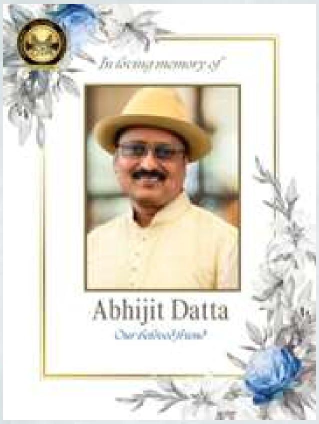

In Loving Memory of Mr. Abhijit Datta

It is with profound sorrow that we announce the untimely passing of Mr. Abhijit Datta, a cherished member of the Board of Directors of Bay Area Prabasi.

Abhijit-da will be remembered as one of the most vibrant and spirited souls in our community. With his ever-present smile, his warm generosity, and his playful spirit, he had a special gift for connecting with people of all ages. He was especially adored by children, who will fondly remember him for the candies he would lovingly share and the magic tricks he performed to fill their eyes with wonder.

Beyond his joyous presence in our community, Abhijit-da was a highly accomplished professional. He built a distinguished career as a Technology Architect at NVIDIA, where his brilliance, dedication, and vision left a lasting impact. His professional excellence was matched only by his personal warmth, kindness, and zest for life.

Abhijit-da's passing leaves a deep void in our hearts. He was a beloved member of the community, a dear friend, and a treasured member of the Prabasi family. His memory will live on in the laughter he sparked, the bonds he nurtured, and the countless lives he touched.

We extend our deepest condolences to his family during this heartbreaking time. May his soul rest in eternal peace, and may we all continue to honor his legacy of joy, generosity, and love.

With respect and remembrance,

Bay Area Prabasi

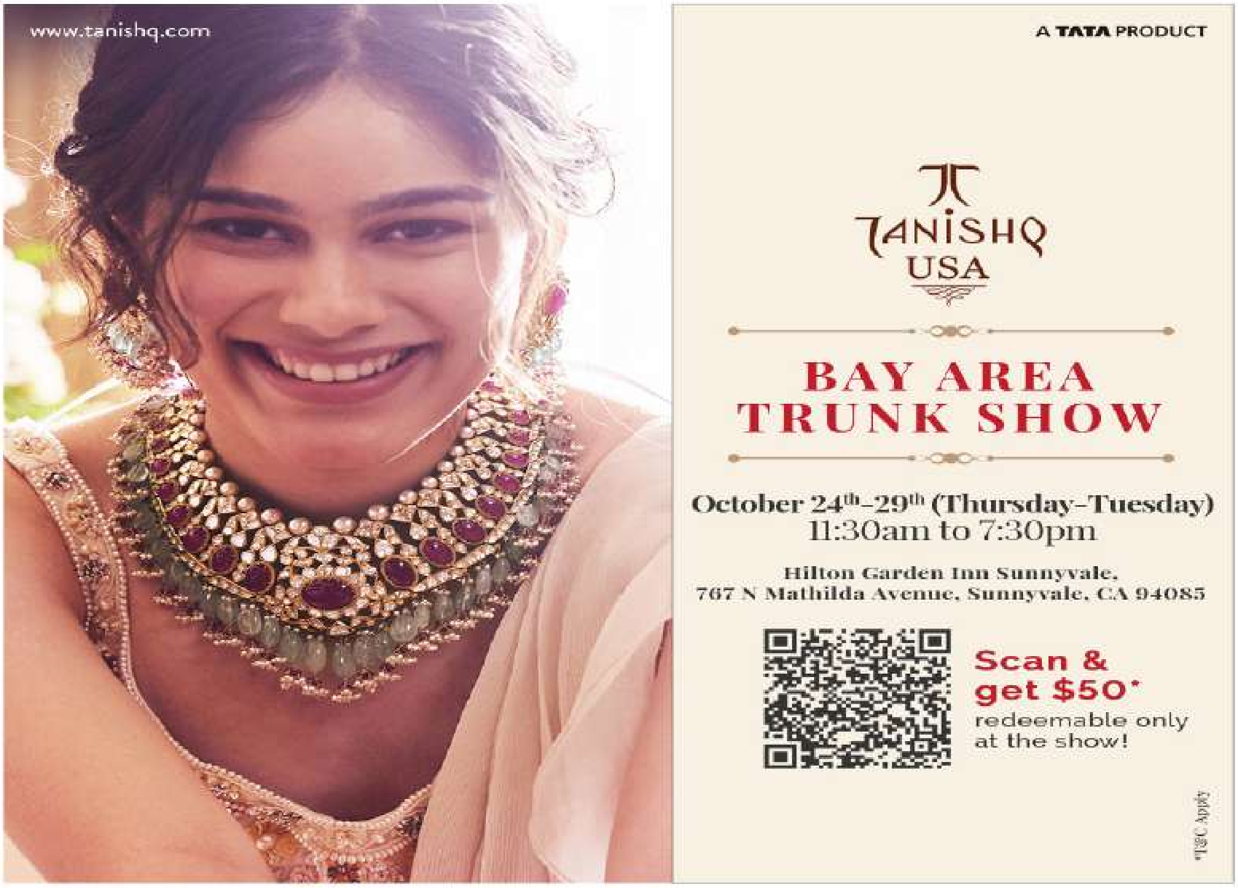

Ethnic Attractions

We like to Congratulate and Best Wishes to
Bay Area Prabasi
for celebrating successes at
Golden Jubilee Celebrations.

Nirmalya Modak

Home Loan Advisor

NMLS # 633685

408.829.0041

nmodak@golden1.com

nmodak.golden1homeloans.com

Golden 1 Credit Union - Home Loans